পল্লী চলো

Back to 'Village

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রকাশক
শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দশ আনা মাত্র

মুদ্রাকর
অনিল চক্রবর্ত্তী
নিউ মডার্ন আর্ট প্রিণ্টার্স
৮৫-এ নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পশ্চিম বঙ্গের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক

মহামহিম মহিমার্ণব

মহামান্যবর শ্রীশ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারির

উদ্দেশে

এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি সসম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধাসহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

বাংলো বাস
[illegible] রোড
কলিকাতা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সবিনয় নিবেদন

আমার বন্ধু-বান্ধব সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, শহরের শিক্ষিত, পদস্থ ও ভদ্র ব্যক্তিবর্গ পল্লীগ্রামের কথা কাণে তুলিবেন না। মিছা কেন পণ্ডশ্রম? তাঁহাদের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, আমি দরিদ্র শ্রমিক মজদুর ও তাঁহাদের ছেলেপুলেদের সহিত মিতালী করিলাম। বন্ধুগণ তাহাতেও খুশী নহেন, বলেন, পল্লীগ্রাম ত অরণ্য। অরণ্যে রোদন করাই বা কেন? আমরা যে দেশ ও যে জাতির লোক সে দেশের লোক রোদনে চিরাভ্যস্ত। আমি কি তাহার ব্যতিক্রম? অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে সেপ্টেম্বর মাসে "পার্থসারথী" 'পুরানো ছবি' নামে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মওলানা আহমদ আলী সম্পাদিত দৈনিক "নবযুগ" পত্রে ধারাবাহিকভাবে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে জোড়া তালি দিয়া, সেলাই ও রিপুকর্ম্ম করিয়া পাঠক-পাঠিকার করকমলে অর্পিত হইল। পল্লীবিমুখ সুধী সজ্জনের চিত্তে রেখাঙ্কন করিতে পারিব এমত ভরসা করি না, তবে বন কাটিয়া, জঙ্গল দাহ করিয়া, নগর-নগরী নির্ম্মাণে অধুনা অনেক শক্তি ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তিকে আগ্রহান্বিত হইতে দেখিতেছি। দুই একটি অদ্ভুতকর্ম্মা 'ময়দানবে'র পরিচয় আমারও জানা আছে। বালিগঞ্জের ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ তাঁহাদের মধ্যে একজন। যুধিষ্ঠিরের অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণের যোগ্যতা এই ময়দানবটির আছে। কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী "রবীন্দ্রনগর" পরিকল্পনা সেই যোগ্যতারই জয়স্তম্ভ। অজ্ঞাতবাসে, বনে ও বিজনে বাঘসিংহ আরও অনেক আছেন, আমার এমন বিশ্বাস। তাঁহাদের কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেও পারিতে পারি, সেই ভরসায় এই দুঃসাহসিক পণ্ডশ্রম। পাঠক ও পাঠিকার নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা, "পল্লী" শব্দ শুনিয়াই আতঙ্কিত হইবেন না। 'পার্থসারথী' পরিকল্পিত পল্লী-নগরীর পিতামহী।

আর একটি দুঃসাহসিক কার্য্যের পরিচয় পাঠক-পাঠিকা পাইবেন। "ভারি ত বিয়ে তার তিন পায়ে আলতা"। এই ত বই, তাই আবার

মহামান্য লাট বাহাদুরের 'উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত করা হইল। বিনানুমতিতে এরূপ কার্য্য করাও নাকি অপরাধজনক। অপরাধ লঘু করিবার উদ্দেশ্যে লাট বাহাদুরের 'নামে' উৎসর্গ না করিয়া 'উদ্দেশে' অর্ঘ্য দান করা হইয়াছে। ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে বেলপাতা ত সকলেই দেয়, নিবারণ করার প্রথা নাই, নিবারণ করিলেও কেহ শুনিবে কি? কিন্তু কেন হেন দুঃসাহস? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অধিকতর দুঃসাহসের আশ্রয় লইতে হয়, ততখানি ধৃষ্টতা আমার নাই। ইতি—

বিনীত

২৩-৯-৫৪ গ্রন্থকার

পল্লী চলো!

১

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭-১৮ সালে একবার সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে'ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর গুরু লোকমান্য তিলকের হুকুম মত সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে দেশটাকে চিনে নিতে বেরিয়ে'ছিলেন। মহাত্মা, তার আগে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন, সেইখানে সত্যাগ্রহ করেছেন, ভাল করে ভারতবর্ষকে চিনতেন না, ভাল করে দেশকে জানতেন না। তাই তিলক মহারাজ তাঁকে দেশ ভ্রমণের পরামর্শ দেন। মহাত্মা গান্ধী এক বছর ধরে ভারতবর্ষের ছোট, মাঝারি ও বড় সহর, ছোট, মাঝারি এবং বড় গ্রাম ও গণ্ডগ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখে গিয়ে, আমেদাবাদে ফিরে, দেশের লোককে পরামর্শ দিলেন, "ব্যাক্ টু ভিলেজ"—"গ্রামে ফিরে চলো"। নিজেও একটি পল্লীগ্রাম বেছে নিয়ে আশ্রম করে বাস করতে লাগলেন। বোধ করি বা গান্ধীজী ভেবেছিলেন, তাঁর দেখা দেখি লোকে "ব্যাক্ টু ভিলেজ" হবে গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু হোল না। 'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ ফেটে চৌচির হতে লাগলো কিন্তু একটি মানুষও গ্রামে ফিরলো না।

আর একজন মস্ত মানুষ পল্লীগ্রামে শাল-মহুয়া-আম জাম-কাঁঠালের বাগানের মধ্যে একখানি আশ্রম গড়ে বসবাস করতে লাগলেন। শুধু ভারতবর্ষের লোকই নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে দলে দলে লোক বীরভূম জেলার বোলপুরের শান্তিনিকেতন

দেখতে আসতে লাগলেন। কবি রবি ঠাকুরের আশ্রম তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী আর কি গরীব, শান্তিনিকেতন দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগলো; বলতে লাগলো, এমনটি হয় না, এমনটি আর দেখেনি। কিন্তু, হায়, একটি প্রাণীও তার নিজের গ্রামে ফিরলো না।

কেন ফিরলো না? ফিরলো না, তার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীটার ভয়। গেলেই রাক্ষসীটা ঘাড় মটকাবে। সত্যিকার ভয় আছে। খাবেই খাবে, সে ত জানাই আছে, তাই ফিরলো না। জলজ্যান্ত মানুষটাকে ধ'রে রাক্ষসীটা খেয়ে ফেলবে, কে তা চায় বলুন? আর একটা কারণও ছিল, সে কারণটা এখনও আছে। সেটি হচ্ছে এই: গ্রামে গিয়ে লোক খাবে কি? চাষ বাসের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল, জমির উর্ব্বরা শক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছিল, আগে যে জমিতে যে-পরিমাণ ফসল জন্মাত কমতে কমতে এখন অর্দ্ধেক হয়ে পড়ছিল, সেই অর্দ্ধেকে স্বচ্ছন্দে পেটের ভাত ও পরণের কাপড় হয় না। আর চাষের কাজে যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, ক্রমাগত রোগে-ভোগা ও আধপেটা খেয়ে দুর্ব্বল হয়ে-পড়া দেহে তত কঠিন পরিশ্রম করা সামর্থ্যে কুলোচ্ছিল না। অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে, এক হাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে, কাঠ ফাটা রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরে কাজ ক'রে ক'রে ক্রমাগত অসুখ-বিসুখ বেড়েই চলেছিল, তাই জননী জন্মভূমি, পিতৃ-পিতামহের কালের বাসস্থান ও চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালাতে লোকে পথ পাচ্ছিল না। মানুষ বাঁচলে তবে ত গান্ধীজীর কথা শুনবে। মরেই যদি গেল, তাহলে আর কি হোল।

ঐ গেল পল্লীগ্রামের দশাই বলুন, আর দুর্দ্দশাই বলুন—ঐ হচ্ছে খাঁটি ছবি। অমনি সেই সঙ্গে শহরের ছবিটাও দেখুন। প্রথম কথা, শহরে সেই রাক্ষুসীটা নেই। আপনি আমি দু'দশ জন লোক হয় ত জানলেও জানতে পারি যে, শহরে, কলকাতার মত শহরেও ম্যালেরিয়া রাক্ষুসীটা আছে, কিন্তু বাইরে থেকে যারা আসছে

তারা দেখতো, রাক্ষুসীটা নেই। লোককে এবেলা ওবেলা 'দে মুড়ি, মা দে মুড়ি—সে মুড়ি নয় মা, সে মুড়ি নয়—লেপ মুড়ি দে' করতে হয় না; দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কোঁৎ কোঁৎ ক'রে কুইনিন্ গিলতে হয় না; নাক-মুখ-চোখ সিঁটকে পাঁচন সিদ্ধ খেতে হয় না, মুখের বাড়া ভাত ফেলে কাঁথা চাপা দিয়ে হুঁ হুঁ করে কাঁপতে হয় না; বাপ রে, মা'র গেলুম রে, মলুম রে ক'রে জ্বরে ধুঁকতে হয় না,—তাদের কাছে শহর ত স্বর্গের সামিল মনে হবেই। তার পর শহরে খাওয়ার ব্যবস্থাও খুব কষ্টসাধ্য বা কঠিন পরিশ্রম সব ব্যাপার নয়। চার পাশে মিল, চার ধারে কল, নানান কারখানা অনেক অফিস—লেখা পড়া জানা লোকও চাকরী পাচ্ছে, লেখা পড়া জানে-না যারা, তাদেরও চাকরী পাবার ভাবনা নেই। একটা না একটা কাজ জুটে যাবেই। তারা দেখলে, শহর অনেক ভাল। শহরে ভিড় বাড়তে লাগলো।

সেই ভিড় বাড়তে বাড়তে আজ এই অবস্থা হয়েছে। শহরে মানুষ জন যেন আর ধরছে না। কেবল নরমুণ্ড আর নর-মুণ্ড। আর ওদিকে বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম শ্মশান। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না, একটা শাঁক বাজে না। হাওয়াই জাহাজ চড়ে উড়ে যাবার সময় সারা বিশ্বটাই মনে হয় ঘুমপুরী, তেমনি বাঙ্গলার পল্লী গ্রামের কাছ দিয়ে গেলেও মনে হবে, প্রেতপুরী। প্রেতপুরীতে মানুষ থাকে না—প্রেতেরাই থাকে। মানুষ চোখে দেখা যায় না। ভূতের ছায়া পড়ে না, তা ত আপনারা জানেন। তাই মানুষ দু' দশজন থাকলেও দেখা পাওয়া যায় না, না থাকার সামিল।

যখন থেকে বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম খালি হতে সুরু হয়েছিল তখন থেকে যদি রাজা অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট একটু সজাগ হ'তেন, তাহ'লে হয়ত পল্লীগুলি প্রেতপুরী হোত না। গভর্ণমেন্ট দেখলেন, কিন্তু উপায় করলেন না। তাঁদের পল্লী নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। শহরকে বড় করাই ছিল তাঁদের কাজ। শহর বড় হ'লে, শিল্প বৃদ্ধি হবে; শিল্প বৃদ্ধি হ'লে গভর্ণমেন্টের পিতৃভূমি

অর্থাৎ কি-না বাপের বাড়ীর—ইংলণ্ডের—শ্রীবিলেতের শ্রীবৃদ্ধি হবে, বিলেতের কল কব্জার বিক্রি বাড়বে, বাণিজ্য বিস্তার হবে, গভর্ণমেণ্ট প্রাণ মন-ধন লাগালেন শহরের দিকে। দেখতে দেখতে শহরগুলো ইন্দ্র-ভুবন হতে লাগলো। লোকে লোকারণ্য। আলোয় আলো, শোভায় শোভা, বাহারে বাহার, দিনে ভগবানের আলো, রাতে বিদ্যুতের আলো—শহরের বাড় বাড়ন্ত দেখে কে? আমাদের সকলের চোখ যখন শহরের শোভায় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, তখন পাড়াগাঁ যে মরে ভূত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে তার দিকে কারও চোখ পড়লো না। অনেক বিলম্বে ও অতি কষ্টে যখন চোখ পড়লো, তখন পল্লীগ্রাম একেবারে খতম হয়ে গেছে। কিছুই আর করবার নেই। শুধু নিঃশ্বাস ফেলতে পারা যায়—হায় কি ছিলো! আর বসে বসে ভাবতেও পারা যায় যে—হায় কি হোলো!

আমরা ঠিক করেছি, আমাদের শ্রমিক মজদুর ভাইদের নিয়েই বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের দিকে যাত্রা করবো। শ্রমিক মজদুর ভাইরাই পৃথিবীর বাসুকী। তাঁরাই মাথায় করে পৃথিবীটাকে ধারণ ক'রে আছেন। তাঁরা মন দিয়ে, নিষ্ঠা সহকারে কাজ করলে পণ্য উৎপন্ন হয়, বাজারে জিনিষ পাওয়া যায়, জিনিষ পাওয়া গেলে জিনিষের দাম সস্তা হয়, লোকের জীবন ধারণ সহজ হয়, মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সমাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, পৃথিবীর অবস্থা সহজ হয়ে আসে। এই অসীম শক্তিধর শ্রমিক মজদুরদের মন যদি সহরের দিক থেকে বাঙ্গলার পল্লী-গ্রামের দিকে ফেরাতে পারা যায়, তাহলে বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম আবার সেই পুরোনো দিনের ছবি ফিরিয়ে পেতে পারে। আবার গ্রামে গ্রামে মানুষের কলরব শোনা যায়; আবার মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টার রব শুনতে পাওয়া যায়; আবার মসজেদে মসজেদে আজানের আওয়াজ উঠতে পারে। আবার গোলায় গোলায় চাল, মরাইয়ে মরাইয়ে ধান, পুকুরে পুকুরে মাছ, বাগানে বাগানে ফল ফুল, বেড়ায় বেড়ায় শাক-শব্জীর লতা দেখতে পাওয়া যায়।

আবার সেই ধান্য রোপণের গান, নবান্নের গান, পিঠে পুলির গান, ঘেঁটুর গান, মনসা ভাসানের গান শুনতে পাই। মরা গাঙ্গে বান ডাকে, শুকনো গাছে ফুল ফোটে, শুষ্ক লতা মুঞ্জরিত হয়। আমরা বন কেটে বসতি বসাতে পারি, জঙ্গল কেটে চাষের জমি বার করতে পারি, পচা পুকুর ও এঁদো ডোবা বুজিয়ে নূতন নূতন ক্ষেত তৈরী করতে পারি। পুকুর গুলোকে কাটিয়ে ঝালিয়ে সরোবর করতে পারি। সরোবরের কানায় কানায় নির্ম্মল জল, জলের ওপরে ভাসবে নানা জাতের, নানা রঙ্গের ও নানা আকারের পদ্ম, আর জলের নীচে ল্যাজ নেড়ে খেলে বেড়াবে মাছ। বড় বড় মাছের গুড়ুম গুড়ুম ঘাই শুনলে মনে হবে বুঝি কামান গর্জ্জন করছে, জল তোলাপাড় হচ্ছে। তা'হলে 'মছলি খাতা বাঙ্গালী' জাতটার মনে আনন্দ আর ধরবে না। বাঙ্গালী মাছ খেতে পেলে আর কিছু চায় না। এক টুকরো মাছ দিয়ে এক পাথর ভাত বাঙ্গালী তার উদর নামক অতল গহ্বরে অনায়াসে পাঠিয়ে দিতে পারে। আমরা প্রত্যেকটি গ্রামে এই রকম বড় বড় পুকুর কাটবো। কতকগুলো বড় পুকুর রাখবো, যাতে মানুষ জন নামতে দেব না, তাতে কেউ চান করবে না, গা ধোবে না, এমন কি পাও ধোবে না—থুতুও ফেলবে না। সেই পুকুরগুলোর জল আমরা খাবো। অন্য পুকুরগুলোয় চান করবো, গা ধোব, গরু-বাছুর নাওয়াবো। কিন্তু খাবার জলের যে সব পুকুর, তা'তে কাউকে নামতে দোব না, শিখিয়ে দেবো—"খবর্দ্দার"। গোটা কতক টিউব ওয়েল (টিপ্ কল?) খোঁড়াতেও পারি, খাবার জলের জন্যে, কিন্তু টিউব ওয়েলের দিকে বেশী নজর দিতে আমি চাই না ভাই। একে ত বিলিতি পাইপ টাইপগুলো এখন পাওয়াই যায় না, তার ওপর টিউব ওয়েল আমাদের বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য মাছের জোগান দিতে পারবে না। মাছের চাষ যদি না হোল ত কি হোল? মাছ না খেলে কখনও মাথা খোলে? বাঙ্গালী গায়ে 'আহবান' করে সর্ষের তেল মাখবে, ঝাঁপাই ঝুড়ে সাঁতার কেটে পুকুরে

বা নদীতে স্নান করবে, মাছ দিয়ে গো-গ্রাসে ভাত খাবে—তবে ত হবে বাঙ্গালী।

এক মাস, দু' মাস, বড় জোর তিন মাস লাগবে, শ্মশান পুরীকে আনন্দধাম করতে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই আনন্দ কানন গড়তে বিদেশ থেকে জিনিষ আনতে ছুটতে হবে না। আমেরিকাতেও করযোড়ে ভিক্ষে করতে যেতে হবে না। কারও দয়ার ভিখিরি হ'তে হবে না, কারও কাছে হাত যোড় করতে হবে না। আপনারা আর আমরা, এই দুয়ে হাত মেলালে ও এক মন হ'লেই কাজ হবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের ভারত সরকারের কাছ দু'টো তিনটে জিনিষ ধার চাইতে হবে। আমাদের নিজে দরই ত ভারত সরকার, সেখানে চাইতে লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই, অনায়াসে চাইবো এবং তাঁরাও বিনা ওজরে দেবেন। কি কি জিনিষ চাইবো, জানেন? শুনুন, তা'ও বলছি।

দু'টো একটা বুল্ ডোজার, দু' একটা ক্যারি অল্, এই হোলেই আপাততঃ আমাদের কাজ চলে যাবে। আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে, মাটি কাটা, গাছ কাটা ও রাস্তা তৈরী, পুকুর কাটা—এই ক'টি কাজ। সেই কাজগুলোর জন্যেই ঐ দুটো কলের জিনিষ আমাদের দরকার। আমার গরীব গুর্ব্বো স্বজাতি ভাই বোনেরা যে চিরকাল কোদাল দিয়ে মাটি কাটবেন আর কুলি হয়ে মাথায় ক'রে মাটি বইবেন, সে আমরা চাই নে, কিছুতেই না।

মহাত্মা গান্ধী বিশ বছর ধরে একাদিক্রমে বলে বেড়িয়েছেন যে, 'কৃষক মজদুর রাজ" প্রতিষ্ঠা করবেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লেই রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। রাম রাজ্য মানে অন্যে কি বুঝেছিল জানি না, আমার মোটা বুদ্ধিতে আমি এই বুঝেছিলুম যে, রাম রাজ্যে গরীব লোকেরও অন্ন কষ্ট থাকবে না, তার মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুরও অভাব হবে না; তাকে ছেঁড়া চিকুটি কাপড়

পরেও থাকতে হবে না, আর, তাকে নোংরা ও ছোট কোনও কাজ করতে হবে না। অন্য সকলের মত সেই গরীব হতভাগাও সমাজের একজন মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে পারবে।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের দেশে সার্ব্বভৌম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে ব'লে শুনতে পাচ্ছি। সকলে এক, সকলে সমান, শ্রেণী ভাগ, স্তর ভাগ থাকবে না, বিভেদ ও বিভাগশূন্য সমাজই গড়ে উঠবে, এ'ও শুনতে পাচ্ছি। তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমাদেরই গরীব ভাই-বোন আজও সেই আগের মত মাটী-কাটা কুলি, মাটী-বওয়া কুলির কাজ ক'রে মরবেন কেন? মাটী কেটে ক'টা পয়সা মজুরী পাওয়া যায়? সেই ক'টা পয়সায় পেটের ভাত হবে? সেই ক'টা পয়সায় পরণের কাপড় হবে? মাথা গোঁজবার গোলপাতার চালাটুকু হবে?

না, না, না,। আমাদের ভাই বোনদের দিয়ে মাটীকাটা কুলির কাজ আমরা করাবো না। বিদেশী যতদিন রাজা ছিল, করিয়েছে করিয়েছে। বিদেশী যখন দূর হয়েছে তখন আর আমাদের আপন জনকে মাটী কেটে ঐ ক'টা পয়সা রোজগার করতে আমরা কিছুতেই দেবো না। সেই জন্য আমি বলেছি, আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বুল ডোজার আনাবো, ক্যারি অল্ চাইবো। বুলডোজার মাটী কাটবে, মাটী টানবে, জমি সমতল করবে, জমিতে মই দেবে, জমির ঢেলা ভাঙবে, জমিগুলিকে চাষের উপযোগী করে দেবে, আমরা চাষের কাজ করবো। মনুষ্যে যে জমি দশ দিনে চাষের উপযোগী করে, বুল্ ডোজার একদিনে সে কাজ করে দেবে। কণ্ট্রাক্টরের চুরি চলবে না, অফিসারের ঘুষও বন্ধ হবে, তিন ফুট মাটি কেটে তেরো ফুটের বিল দাখিল ক'রে জুচ্চুরি ক'রে টাকা আদায় করতে কেউ পারবে না। বুল ডোজার ক্যারি অল্ যতখানি কাজ করবে, তার হিসেব সঙ্গে সঙ্গে কলের গায়েই লেখা থাকবে। তার সঙ্গে চুরী জুয়াচুরীটি চলবে না।

বড় বড় জঙ্গল, বুল ডোজার লাগিয়ে দাও—গোঁত্তা মেরে বড়

বড় গাছ ফেলে মায় শেকড় পর্য্যন্ত উপড়ে জমি বার করে দেবে। ক্যারি অলকে লাগিয়ে দাও, জঙ্গল, জলা, বন-বাদাড় সে সব সাফ করে দিয়ে যাবে।

এঁদো পুকুর, হাজা মজা ডোবা বোজাতে হবে? ওদের লাগিয়ে দাও, এক এক ঘণ্টায় এক একটা পুকুর বুজিয়ে সমতল করে ফেলবে।

পুকুর—সরোবর কাটতে হবে? বেশ ত, ওদের দুটি ভাইকে লাগিয়ে দাও না। পুকুর ত ছেলে মানুষ, বড় বড় দীঘি কেটে দিয়ে যাবে। দীঘি কেটে, তার পাড় সাজিয়ে, পাড়ে পাড়ে যাতে আমরা সুপারি, নারকেল ও তালের গাছ লাগাতে পারি, ঐ কল দুটো তাও করে দিয়ে যাবে।

ভাই, আমি একটি কথাও বাড়িয়ে বলছি নে। আমি ঐ যন্ত্র দৈত্য দু'টার কাজ নিজের চোখে দেখেছি। দেখেছি আর হাঁ হয়ে থ বনে গেছি। তোমরা যদি যুদ্ধের সময়ে এয়ার ফিল্ড—হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি তৈরী দেখে থাক, কিম্বা যুদ্ধের সময়কার রাস্তা তৈরী করতে দেখে থাক, তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, তোমরাও আমারই মত হাঁ হয়ে গেছ। ঐ দৈত্য দুটোকে দিয়ে যুদ্ধের সময়ে কত কাজই যে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে করিয়ে নেওয়া হয়েছিল সে আর বলে শেষ করা যায় না। সে দৈত্যগুলো ত আমাদের দেশেই আছে। কতকগুলো আছে, আমাদের ভারতবর্ষে আর কতকগুলি আছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের লোক পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের কাছে চায়, চাক্, না চায়, না চাক্। আমরা কিন্তু চাই।

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যখন ঝগড়া নেই—ভাবই আছে, তখন তাঁদেরও পরামর্শ নোব বৈ কি—চাইতে বলবো বৈ কি। অবশ্য চাওয়া না চাওয়া তাঁদের মর্জ্জি।

আমরা আমাদের পশ্চিম বাঙ্গলার লাট বাহাদুর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারির কাছে গিয়ে বলবো—

মহারাজ! ভয় ক'রে, না, নির্ভয় ক'রে?

লাট বাহাদুর নিশ্চয় বলবেন, নির্ভয়ে কহ।

আমরা বলবো, মহারাজ, আমরা আমাদের পল্লীগ্রাম গড়বো। আমাদের জন্য আপনি ঐ বুল ডোজার ও ক্যাটার পিলার নামে যন্ত্র দানব দু'টো আনিয়ে দিন। আর আনিয়ে দিন, দু' দশজন সৈন্য সামন্ত। তারা এসে ঐ যন্ত্রগুলো চালাবার কাজ আমাদের শিখিয়ে দিয়ে যাবে। তাদের আমরা বেশী দিন আটকে রাখবো না, কাজ শিখে নিয়েই ছেড়ে দোবো।

লাট বাহাদুর কি আমাদের বিমুখ করবেন? কক্খনো না।

নিশ্চয় খুশী হয়ে বলবেন, তথাস্তু। তাই হবে গো, তাই হবে। আমরা তাঁকে নমস্কার ক'রে বলবো, জয় হিন্দ!

৩

ইংরেজ যতকাল আমাদের দেশের রাজা ছিল, ততদিন আমরা--দেশী লোকেরা ছিলুম যেন ঠিক কুকুর বেড়াল। অবিশ্যি দু'দশ জন বাবু ভায়া ও মিঞা সাহেবকে ইংরেজ-রাজা পেয়ার করে রায় সাহেব, রায় বাহাদুর বানাতো, আইয়ে খান সাহেব আইয়ে খান বাহাদুর বলে তসলিম্ জানাতো বই কি, কিন্তু বেশীর ভাগ লোককে—আপনার ও আমার মত লোকদের ঠিক কুকুর বেড়ালের মত দেখতো। এই বাঙ্গলাদেশের এক একটা জেলা থেকে দালাল লাগিয়ে চাল, ডাল সব সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দারুণ অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতো, এ কি আমরাই দেখিনি? সহরের লোকে না দেখে থাকতে পারেন, না বুঝতে পেরে থাকেন, আমাদের, যাদের পল্লী গ্রামে বাড়ী ঘর কিম্বা পল্লীগ্রামে যাতায়াত আছে, তারা ত হামেসাই এ সব কাণ্ড দেখছি। যখন খুব অন্নকষ্ট হোল, দুর্ভিক্ষ দশা উপস্থিত হোল, তখন ইংরেজ রাজা বাহাদুর জেলার হাকিম-হুজুরদের কাছে ঢালোয়া হুকুম পাঠালেন, টেষ্ট-রিলিফ খুলে দাও। রাস্তা করাও, বাঁধ দেওয়াও, জাঙ্গাল কাটাও।

অমনি হুজুররা এ'লেন, বড় হুজুর, মেজ হুজুর, ছোট হুজুর, দারোগা হুজুর, জমাদার হুজুর, দফাদার হুজুর, চৌকিদার হুজুর, হুজুরে হুজুরে ধুলপরিমাণ। এসে ঢাঁশোয়া হুকুম, খালি হুকুম, হুকুমে হুকুমে তল্লাট ছেয়ে দিলেন—"নে বেটারা কোদাল নে, ঝুড়ি নে, চল্, চল্, মাটি কাট্‌বি চল্, রাস্তা খুঁড়বি চল্—চল্‌রে চল্—ডোল পাবি।" ডোল্ কিরে বাবা? ঢোল জানি। ডোল কি ঢোলের ভায়রা ভাই নাকি! না কিন্তু। ডোল্ কাকে বলে জানেন না ত? শুনুন, মশাই, বল্‌ছি। মুষ্টিভিক্ষেকে ডোল্ বলে। একে মানুষগুলো খেতে না পেয়ে কঙ্কাল-সারা হ'য়েছে, ধুঁকছে, পড়ে যাবে-যাবে অবস্থা, হুজুররা হুকুম দিলেন, রোজ এই এত্তো ক'রে মাটী কাটবি, বুঝলি? তবে এই মুষ্টিভিক্ষ—এই ডোল পাবি।

আপনারা বলুন, একি মহাপাতক নয়? অন্নকষ্ট সৃষ্টি করাই ত এক মহাপাপ, তার উপর ঐ হাড়িসার, গাজনের ঢাকের মত পেট, অস্থিচর্ম্মসার লোকগুলোকে ঐ রকম উদ্বাস্ত খাটিয়ে নিয়ে ডোল দেওয়া কি আরও বড় মহাপাপ নয়—আপনারাই বলুন? কিন্তু ইংরেজ অনায়াসে অনেক কাল ধ'রে তাই চালিয়েছে। বেশ চালিয়েছে। কেনই বা চালাবে না বলুন? ভারতবর্ষের লোককে কি তারা মানুষ ব'লে গণ্য করতো? রাস্তার কুকুর বেড়ালও যা, কালা আদমিরাও তাই।

কিন্তু এখন ত আর সে দিন নেই। এখন অন্নকষ্ট সৃষ্টি ক'রে মুষ্টিভিক্ষা কে দেবে, কাকে দেবে? নিজেদের দেশের লোককে? নিজের ভাই বোনকে? অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। নিজের দেশের লোক, নিজের জাত ভাই গভর্ণমেন্ট কি কখনও সে কাজ করতে পারে? করতে পারা ত দূরের কথা, ভাবতেও পারে না।

আমার কথা কিন্তু তা নয়। আমার কথা হচ্ছে, আমরা গভর্ণমেন্টের মুখের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবো কেন? আমাদের ঘরের খোকা খুকুরা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে বটে বাপ মা দিদি ঠাকুমার পানে। তাঁরা খাইয়ে দেবেন, নাইয়ে দেবেন, শুইয়ে দেবেন, ঘুম

পাঠাবেন। আমরাও কি সেই ভাবে চেয়ে থাকবো, গভর্ণমেণ্টের পানে? দায় পড়েছে আমাদের। পৃথিবীর স্বাধীন কোন দেশের কোন লোক পরাধীন ভাবে কারও পানে চেয়ে থাকে না। স্বাধীন কথাটার মানেটা কি হোল তাহ'লে?

না, আমরা পরমুখাপেক্ষী হ'ব না। কেবল যেটুকু সাহায্য নইলে নয়, সেইটুকু সাহায্যই চাইবো, তা'ছাড়া নিজেরাই সব করতে পারবো এবং করবো। আপাততঃ আমাদের পল্লীগ্রাম তৈরীতে ঐ যন্ত্র বিত্তগুলো পেলে, বাকীটুকু আমরা নিজেরাই ক'রে নিতে পারবো। বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম কি ছিল, তা আমরা গল্পে শুনেছি, কেতাবে পড়েছি, গানে শুনেছি, গাথায় পেয়েছি। শুনেছি তার মাটীতে ফলতো অমৃত তার গাছে ঝুলতো অমৃত, তার জলে বয়ে যেতো অমৃত। এ সব স্বপ্ন নয়, গল্প নয়, উপন্যাস নয়, রচা কথাও নয়—খাঁটি সত্য কথা। আজকের ভগ্ন দশা দেখলেও সেটা অনায়াসে বোঝা যায়। গঙ্গার তীরে ভাঙ্গা সানু দেখে কি বুঝতে কারও কষ্ট হয় যে, এককালে কি সুন্দর বৃহৎ ঘাটই না ছিল সেটা। আবার তাই হবে, আবার সেই অমৃত ফলবে, অমৃত ঝুলবে, অমৃত বয়ে যাবে। পল্লীগ্রামই ছিল, দেশের লক্ষ্মী, জাতির অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা অন্ন দিলে তবেই লোকে খেতে পেতো। সেই পল্লী লক্ষ্মী ঠাকরুণ বিরূপ হয়েছেন বলেই আজ সারা দেশের এই দুর্দ্দশা হয়েছে, এত হাহাকার উঠেছে।

ক'দিন থেকে কলকাতা শহরে মাছের দুর্ভিক্ষ যাচ্ছে। মেছোরা দাম কমাবে না, লোকেও তত চড়া দাম দিতে পারেন না। কলকাতায় পুকুর থাকতে পারে, তার মাছ কিন্তু বিক্রী হয় না। বিক্রীর মাছ সবই চালানী। বেশীর ভাগ আসে, পূর্ব্ববঙ্গ থেকে। এখন পূর্ব্ববঙ্গ আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেখান থেকে মাছ না আসে যদি? বাঙ্গালী গিন্নীরা মাছ না হলে ভাত খেতে পারবেন কি? ছেলেদের মুখে ভাত রুচবে কি? কর্ত্তার থালায় "আঁসটে" গন্ধ না থাকলে গলা দিয়ে তাঁরা ভাত উলবে কি? উলবে না, সে

আপনিও জানেন, আমি মাছ খাই না, কিন্তু আমিও জানি, সবাই জানেন। কিন্তু উপায় কি? সহরে মাছের দুর্ভিক্ষ; আর পল্লীগ্রামে মানুষ নেই! নদীতে মাছ থাকলেও ধরবার লোকাভাব। বাঃ, কি চমৎকার অবস্থা।

৪

খামারগাছি স্টেশনে নেমে, শক্রর মুখে কামিনী বোষ্টমীর দইয়ে জিলিপি দিয়ে, তিপান্নটি নানা বয়সের ছেলে মালকোচা এঁটে, সমান তালে পা ফেলতে ফেলতে, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বন্দেমাতরম্' গাইতে গাইতে মুক্তারপুর, বাগেশ্বরপুর, কাবুশপুর, হাতিকান্দার মাঠ-বন ঘাট কাঁপাতে কাঁপাতে, যখন সেই ঠিক দুপুর বেলা বট তলায় বৃদ্ধ বুড়ো-শিবের মন্দিরের চত্বরে পৌঁছলো, তখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, পৃথিবী যেন পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। তেষ্টায় ছেলেদের ছাতি ফাটবার উপক্রম, সঙ্গে ক'রে যে জল তারা এনেছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। পথে আসতে আসতে নির্ম্মল-জলের নদী দেখা গেছেলা বটে, ছেলেরাও ছুটে গিয়ে অঁজলা ভরে জল খেতে চাইছিল বটে, কিন্তু আমরা দু'তিন জন বুড়া হাবড়া সর্দ্দার সঙ্গে ছিলুম যারা, আমরাই তাদের সে জল খেতে দিই নি। যে নদীতে স্রোত বয়, ঢেউ খেলে, জোয়ার আসে, ভাঁটা বয়, সে নদীর জল খেতে পারা যায়, এ আমরা জানতুম, তবু সাবধানের বিনাশ নেই, ভেবে ছেলেদের খেতে দিই নি। বলেছিলুম, চল্ না, সদাইদের বাবার দেশে যাই, নারকেল গাছ থেকে ডাব পাড়িয়ে দোব, যত পারিস, ডাবের শীতল জল খাস্। কিন্তু এই ত গ্রাম, ঐ ত কত নারকেল গাছ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ কৈ। কার গাছ, না জেনে, না ব'লে ত আর ডাব পাড়া যায় না। চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, আমরা জানি; কিন্তু বিদ্যে যতই বড় হোক, আমাদের তা'তে দরকার নেই। ছেলেরা একটা চক্কর দিয়ে এসে বললে, ঘুম পুরী, মানুষ নেই। অতএব এই সদা জাগ্রত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী বুড়ো শিব

ঠাকুরকে সাক্ষী রেখে ডাব পেড়ে খাওয়া যাক্। সিদ্ধান্ত হোল, গাছের মালিক এলে দাম দেওয়া যাবে।

এই রকম সলা-পরামর্শ হচ্ছে, একজন আধবুড়ো গোছের লোক বগলে একখানা চ্যাটাই, চিকুট ময়লা বালিশ ও হাতে হুঁকো কলকে নিয়ে সেই দিকে আসছে দেখা গেল। লোকটি অন্যমনস্ক হয়ে বেশ আসছিল কিন্তু যেই এদিকে নজর পড়া, অমনি ধাঁ করে পেছন ফিরে, চেঁ চাঁ, যেদিক থেকে আসছিল, সেইদিকে পা চালিয়ে দিলে। ভূত দেখবার সম্ভাবনা হোলে। লোকে যেমন চমকে উঠে "বাবা গো" ব'লে স'রে পড়ে, এই লোকটিও তেমনই বোঁ ক'রে রাইট্ এবাউট টার্ণ করে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে স'রে পড়লো। আমরা যত ডাকি "ও মশাই, ও মশাই, শুনুন না মশাই, ও ভদ্র লোকটি মশাই, ও হুঁকো হাতে মশাই, ও বালিশ বগলে ভাল লোক মশাই, দয়া ক'রে একটিবার এদিকে আসুন না মশাই, আপনার নাম জানি না মশাই, একটি কথা শুনে যান্ না মশাই।" আর মশাই! মশাই তৎক্ষণ পগার পার। কে শোনে কার কথা? হন্ হন্ ক'রে প্রস্থান। নীতিশটা আমাদের ভারি বহড়ে, সে বললে, দাঁড়াও, ধ'রে আনি ব'লে, পায়ে একটুও শব্দ না ক'রে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে আস্তে গিয়ে দৌড়ে লোকটিকে পাঁজা কোলা ক'রে তুলে, একেবারে আমাদের দরবারে এনে হাজির। লোকটি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে তোমরা আমায় ধ'রে এনেছ আমি মাঁকে বলে দোব। লোকটির বয়স কত হবে কে জানে? পঞ্চাশ ষাট্ হতে পারে, কিন্তু নালিশ করার ধরণ দেখে মনে হোল— তার বয়স পাঁচ বছরের বেশী নয়।

নীতিশ বললে, আমরা কি তোমাকে মেরেছি, না, কেটেছি যে তুমি মা'র কাছে নালিশ করবে?

লোকটি আরও কাঁদ কাঁদ হয়ে ব'লে উঠ্‌লো, আমি ছেলেমানুষ। তোমরা আমাকে ধরলে কেন?

নীতিশটা তেমনই দুষ্টু, বললে, ধরিছি তা কি হয়েছে কি? আমরা ত মানুষ।

সে তার মস্ত বড় মাথাটা নেড়ে বললে, না, তোমরা ছেলেধরা। আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে ধরেছ। আমি মা'কে বলে দিই গে।—বলতে বলতে, ভ্যাঁ।

পরে ভাব হ'তে জানা গেল যে, সেই জয় ঢাক-পেট লোকটি মধ্যাহ্ন ভোজনাদি শেষ ক'রে বটের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় দিবানিদ্রা দিতে আসছিল কিন্তু দিশী 'স্বরাজী পল্টন" দেখে ছুটে ফিরে তার মা'কে খবর দিতে যাচ্ছিল। আমরা আগাম ও ডবল দাম দিচ্ছি দেখে তার নারকেল গাছের সারি দেখিয়ে দিলে, বললে, যত পার খাও, কিন্তু দামটা মা'কে বুঝিয়ে দিয়ো, আমি ছেলে মানুষ, হিসেব বুঝি নে। "আহা, ছেলে মানুষই বটে, পঞ্চাশ বছরের খোকন মণি।" ডাব খাওয়ার পর সে তার মা'কে ডেকে আনলে, আমরা দাম দিলুম। ঐ লোকটি যখন তার মা'কে খবর দিতে গিয়েছিল, তখন গ্রামে আরও যে দু'পাঁচ জন লোক ছিল, তাদেরও ডেকে এসেছিল। দেখতে দেখতে অনেকগুলি হাড্ডিসার 'দামোদর' মানুষ এসে আমাদের ঘিরে বসলেন।

প্রশ্নোত্তরমালা চলতে লাগলো এই রকম।—মশাইরা? আপনারা? কোথা থেকে আগমন? কোন্ জাতি? পেশা? বিষয়কর্ম্ম? ঠাকুর? বিবাহ আদি—ইত্যাদি।

জবাব:

"আমরা ভবঘুরে। জাতি, অজ্ঞাত। পেশা, বিষয়-কর্ম্মের সন্ধানে আসা। ঠাকুর চাকর নাই। আপনি খেতে ভাত জোটে না, শঙ্করীকে ডাকা কেন?"

দ্বিতীয় দফা প্রশ্ন:

এখান থেকে কখন্ এবং কোথায় যাওয়া হবে? এবং এইক্ষণে কি ভোজন?

উত্তর:

"আপাততঃ কিছু কাল এইখানেই অবস্থান। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।"

লোকগুলি তারস্বরে ব'লে উঠলো, এমন কর্ম্মটি করবেন না, এমন কর্ম্মটি করবেন না। এখানে হাওয়ায় ম্যালোয়ারী, মাছিতে ম্যালোয়ারী, জলে ম্যালোয়ারী, ভাত তরকারীতেও ম্যালোয়ারী।

আমাদের নীতিশ খিষেটারী ঢঙে কি একটা কবিতা পড়লে, তার শেষটা হচ্ছে—কলকাতায় ঘর মোর, জয় হিন্দ হাঁক মোর, "আমি কি ডরাই ভায়া ছাই ম্যালোয়াড়ীকে?"

লোকগুলি এইবার ভয় দেখাতে সুরু করলে। বললে, পথে জোঁক আছে। আমরা বললুম, আমাদের সঙ্গে লবণ আছে; জোঁকের মুখে দেব। তারা বললে, গ্রামে পাগলা কুকুরের বড় দৌরাত্ম্য। আমরা বললুম, আমরা মুগুর রাখি। তারা বললে জলে জীবাণু। আমরা বললুম, ফুটিয়ে নেব। তারা বললে, ভাত খাবে কি ক'রে? এখানে মাছ পাওয়া যায় না। আমরা বললুম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম। তারা বললে, এদেশে ডাক নেই। তারা পোস্টাফিস সব কথা বলতে চাইছে, আমরা যেন বুঝেও বুঝলুম না। বললুম, আমরাই ডাক ছাড়বো, ভয় কি। তারা জিজ্ঞাসা করলে, এখানে খাবে কি? আমরা বললুম, যা আপনারা দেবেন। তারা জিজ্ঞাস করলে, শোবে কোথায়? আমরা বললুম, এই শিব ঠাকুরের বাড়ীতে। শিব ঠাকুর ভদ্রলোক, সদাশয় ব্যক্তি, তার এত বড় আটচালা আর তিনি একলা মানুষ, আপত্তি করবেন না, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পাচ্ছি।

এইবার তারা হেসে উঠলো এবং হাসলেই ভাব, আমাদের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেলো। একজন এক ধামা মুড়ি, আর একজন আধ সরা গুড়, আর দু'জনে দু'ঘড়া জল এনে হাজির করলে। বললে, সংসারে বড় টানাটানি; নইলে অতিথি নারায়ণের সেবা করতে তারা ডরায় না। তখন বসে বসে গল্প গাছা চলতে লাগলো।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তিন চারদিন পর্য্যন্ত তাদের ভয় কাটে নি। একবার নাকি এক দল বেদে এসে চুরী চামারি করে গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। সেই থেকে বিদেশী দেখলেই

তাদের ভয় করে। কিন্তু ক'দিন কেটে যেতে যখন দেখলে যে কারও ঘটিটে বাটিটে চুরি হোল না, কারও বেড়া থেকে একটা ঝিঙে কুমড়ো উচ্ছে সীম খোওয়া যায় নি, কারও কচি ছেলে মেয়েও উধাও হয় নি তখন আমাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব জন্মতে সুরু হয়ে গেলো। আমরাও কাজ সুরু করলুম।

আমাদের নির্ম্মলটা যে 'ভাবি মেয়ে নেকড়া,' মেয়ে মহলেই তার যত জারিজুরি, তা আমরা সবাই জানতুম। গঞ্জনা যে দিতুম না তা'ও নয়; ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না করতুম, তা'ও নয়। কিন্তু যতই রঙ্গ রহস্য ঠাট্টা বিদ্রূপ, হাসি মস্করা করা হোক্ না কেন, নির্ম্মল যেন পাঁকাল মাছ, কাদায় বাস করলেও মাছের গায়ে কাদার ছিটটুকু যেমন লাগে না, নির্ম্মল তেমনই কিছুই গায়ে মাখতো না। মানুষেরও স্বভাবও এই যে, নরম মাটিতে সবাই অপকর্ম্ম করে, নির্ম্মল যত চুপ ক'রে থাকে, আমাদের ছেলেদের টিট্‌কিরিও তত বেড়ে যায়। কিন্তু এই অজানা অচেনা গণ্ড পল্লীগ্রামে সেই মেয়েলি স্বভাব নির্ম্মলই আমাদের জান্ ও প্রাণ বাঁচালে কি ক'রে, তাই বলছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে, বুড়ো শিবতলায় বারোয়ারিতে বিধুভূষণের যাত্রা গান হয়েছিল। আটচালাখানা খাড়া ছিল। আমরা সেই খানে চট্, চেটাই, বস্তাও থলে টাঙ্গিয়ে একটু আধটু ঘিরে টিরে আড়াল আবডাল্ ক'রে টেনে-নিয়ে, মাদুর বিছিয়ে গড়াগড়ি শুয়ে পড়লুম। প্রথম দিনটি, সকলের সঙ্গে বাড়ির দেওয়া খাবার টাবার ছিল, তাই খাওয়ার ভাবনা ছিল না, রান্না বান্নারও হাঙ্গামা ছিল না। এক ঘুমে, সকাল! সারা রাত শেয়াল ডেকেছে, হুক্কা হুয়া রবে অন্ধকার রাত যেন চমকে চমকে উঠেছে, মাথার ওপরকার বটগাছটার ডালে ব'সে পেঁচা চেঁচিয়েছে, বাদুড়গুলো সারারাত ঝটপট ঝটপট্ করেছে, আমরা কিন্তু অঘোরে ঘুমিয়েছি; শব্দ টব্দগুলো কাণে গেলেও ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। ঘুম ভেঙ্গে, চোখ খুলে দেখি, সামনের নারকেল গাছের মাথায় বালদোগুলো সোণালী

রঙ মেখে দুলছে। আমাদের চোখে এ এক নতুন ছবি। আমরা এই জিনিসটি সেদিনের আগে আর দেখি নি। সহর থেকে বেরোবার সময়ে আমরা যে কটি সঙ্কল্প করেছিলুম, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, চা তৈরী ক'রে খাব না। কোনও রকম নেশার বশীভূত না হবার জন্যেই ঐ সঙ্কল্প। তবে এর মধ্যে একটু ফাঁকিও ছিল। আমাদের দলে যে দু'জন বুড়ো আছেন, তাঁরা খেতে চাইলে, আমরা চা তৈরী ক'রে দোব, আমরা খাই না খাই, তাঁদের কষ্ট দোব না। কোনদিন এক আধ কাপ্ বেশী থাকলে, কি, শরীর টরীর ম্যাজমেজে থাকলে তাঁদের দৌলতে দু'এক ঢোঁক খেলেও খেতে পারি, এইমাত্র। তবে তাঁদের জন্যে চা ক'রে দিতে দেরী করবো না এই কথা ছিল, তা ভোরবেলা দেখা গেল সেই বৃদ্ধ মানুষ দুটি সকলের আগে উঠে নিজেরাই তৈরী ক'রে চা খেয়ে নিয়েছেন। তাঁদের নাকি চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। এত কালের অভ্যাস, ছাড়তে পারবেন কেন?—অসুখ হয়ে পড়তে পারে—আতুরের পক্ষে নিয়ম নাস্তি।

সরু পথের দুধারে আশ শ্যাওড়ার বন, বাগানের ধারে ধারে বড় বড় নিমের গাছ, টুথ ব্রাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বাঁচা গেল। মুখটুখ ধুয়ে আমরা বৈঠকে বসে 'কি করা যাবে' পরামর্শ করছি। একটু বেলা হতে দেখি, পুঁটির মা'র পুঁটি নির্মল দাদার জন্যে তাদের লাউ মাচা থেকে মস্ত একটা তম্বুরো গোছের লাউ নিয়ে হাজির। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই সৈরভী মাসী ছোট পেতের পুরো (ছোট ঝুড়িকে পেতে বলে) এক পেতে কুচো চিংড়ী এনে 'বোনপো' 'বোনপো' ক'রে ডাকতে লাগলেন। হরি দুলে আঙট কলা পাতার ঠোঙ্গা বানিয়ে এক পণ (আশীটায় এক পণ হয়) তাল-শাঁস 'বামুনছেলেকে' খেতে দিয়ে গেলেন। দেখো কাণ্ড একবার! নির্ম্মল মুখুজ্জে কাল বিকেলে একটিবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে পাড়ায় বেরিয়ে কি রকম কুটুম্বিতা জমিয়ে এসেছে, দেখো। আমরা ত অবাক। তারপরে আরও আছে, শুনুন-না। লক্ষ্মণ গোপের মেয়ে ছোট খোলার এক খোলা দই দিয়ে ব'লে গেল, মা দুঃখু করছে,

ঘরে চিনি ছিল না ব'লে নিমু দাদাকে টোকো দই দিতে হোল। এর পরে, চিনি পাওয়া গেলে একদিন মিষ্টি দই নিয়ে আসবে বলেছে। কামিনী বোষ্টমী এসে এক গাল হেসে বললেন, হ্যাঁগা ছেলে, কুমড়োর মোরব্বা খাবে ?

আমাদের ক্যাম্পে নির্ম্মলের সুখ্যাতি ধরে না। ছোঁড়া নিন্দেও গায়ে মাখে না, সুখ্যাতিতেও তা থিয়া তা থিয়া নৃত্য করে না। বলছে, কলকাতায় একটি মা রেখে এসেছিল, এখানে সে ঘরে ঘরে মা পেয়েছে। আর মায়ের ছেলেরা তার ভাই, মায়ের মেয়েরা তার দিদি, ভগ্নী ও বোন্ হয়ে গেছে। এই হচ্ছে খাঁটি বাঙ্গলা দেশ , সব আপন, সব আত্মীয় , কেউ পর নয়। তবে মুশকিল হলো এই যে, মায়েরা, দিদিরা, বোনেরা বলেছেন, রোজ একবার ক'রে যেতেই হবে। সেটা যে কি ক'রে পেরে উঠবো, সেইটেই ভেবে উঠতে পারছে নে।

আমরা সকলে নির্ম্মলকে বললুম, মুশকিল বললে ত হবে না চাঁদ, যেতেই হবে ; নইলে এমন চর্ব্বচুষ্য আমাদের হবে কি ক'রে ?

নির্ম্মল বললে, গান বাঁধছি , গ্রামের ছেলেমেয়েদের তালিম দিয়ে গান বার করতে হবে। একদিন যদি একটা গানের দল বার করতে পারি, তা হ'লে আমাকে আর পায় কে ? আশে পাশের বিশ ত্রিশ খানা—কি যতগুলো গ্রাম আছে, সমস্ত গ্রামের সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের পোষ্টোটিই আমার। কিন্তু গানটা বেশ জুৎসই লাগছে না, সেই যা দুঃখ।

ক্যাম্পে রব উঠল, কৈ দেখি, কৈ দেখি। কি গান বাঁধলি ? দেখি ?

নির্ম্মলও দেখাবে না, ছেলেরাও ছাড়বে না। অনেক ক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর, নির্ম্মল তার দপ্তর নিয়ে এলো। পাততাড়ি খুলতে খুলতে বললে, কিন্তু একটি কড়ার করতে হবে। ভাল হোক্ মন্দ হোক্, ভুল হোক্ নির্ভুল হোক্, ছন্দ থাক্ আর ছন্দ পতন হোক্,

সমবেত গানে সকলকে যোগ দিতে হবে। আমার সঙ্গে সকলকে গাইতে হবে।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, কথা দিচ্ছি, কথা দিচ্ছি," সকলেই এক বাক্যে ব'লে উঠলো।

নির্ম্মল বললে, আমার নতুন মা-বোনেদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা হয়েছে, গানটা গস্ত হলেই নির্ম্মল মিউজিক্যাল পার্টি আশে পাশের বিশখানা গ্রাম—একদিন এক গ্রাম—প্রদক্ষিণ করবে। একটা হাতকান্দা নিয়ে প'ড়ে থাকলে ত চলবে না ভাই, আঁশ-পাশের বিশখানা গ্রাম আছে। তাদেরও মাতাতে হবে ত?

আমরা সকলেই বললুম, হ্যাঁ, ছোঁড়ার বুদ্ধি আছে বটে! বাহবা কি বাহবা! নে, এখন গান ধর্ দেখি!

নির্ম্মল সুর করে পড়তে লাগলো ঃ

"পল্লী চলো, পল্লী চলো, পল্লী চলো ভাই।
কাকের চোখ চল চল
উলসে চলে নদীর জল,
সরল জীবন সহজ মানুষ জটিলতা নাই।
পল্লী চলো, পল্লী চলো, পল্লী চলো ভাই।

পাখীর গানে প্রভাত হবে
সন্ধ্যা নামে গোধন রবে
শ্যাম সবুজ মাঠে ঘাটে আবিলতা নাই।
......পল্লী চলো ভাই।

তাল তমাল গাছের সারি
তারাই খাড়া গ্রামের দ্বারী
উদয়াস্ত পাহারা তারা, অলসতা নাই।
.. ...পল্লী চলো ভাই।

ধুঁকছে মানুষ, নাই যে প্রাণ
বিরাম নেইক হাসি ও গান ;
সবল নব পল্লী নারী কুটিলতা নাই।
···· পল্লী চলো ভাই।

কঙ্কালসার প্রাচীন গেহ
ভুলেও চেয়ে দেখে না কেহ—
নীরব এই বনভূমি শব্দ সাড়া নাই।
···· পল্লী চলো ভাই।

বৃদ্ধ শিব বটের তলে বাস
একলা ঠাকুর ফেলেন দীর্ঘশ্বাস,
কে দেয় জল, বেল পাতা কে, পূজারতি নাই।
পল্লী চলো ভাই।

নিরাশঘেরা মলিন ছবি,
স্বপ্ন গড়া গল্প সবই ;
ইতিহাসের শুষ্ক পাতা সজীবতা নাই।
··পল্লী চলো ভাই।

অতীত যদি তাহে লুপ্ত
স্মৃতি কিন্তু নহে সুপ্ত
মায়ের মত স্নেহভরে ডাকার বিরাম নাই।
· ·· পল্লী চলো ভাই।*

আমাদের সঙ্গে গ্রামের লোকের ভাব হোল, বন্ধুত্ব হোল, ক্রমে ক্রমে ভালবাসাও বেশ গাঢ় হয়ে উঠলো। তারা ক্ষেত-খামারের খাবার জিনিষ আমাদের খেতে দেয়, বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিরণী বা ওলা বিবির পূজা হোলে প্রসাদ খেতে ডাকে। ছোট খাট অসুখ বিসুখে আমাদের কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নেয় বা

* লেখকের পরিচিত এক পল্লী-কিশোর রচিত এবং তাহার সানন্দ সম্মতিতে অবিকল মুদ্রিত।—লেখক।

টোটকা টাটকা মুষ্টিযোগ জেনে যায়, আর তাইতে উপকার হোলে আমাদের সুখ্যাতি করতে আসে। তারপর ছোট খাট ঝগড়া ঝাঁটিতে আমাদের মধ্যস্থ মানে, আমরা যে ভাবে মিটিয়ে দিই, তা'ও মেনে নেয়—কথায় কথায় এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর নালিশ করতে সদরে ছোটে না। গ্রামের তিন জন প্রবীণ লোক আর আমাদের শিবিরের দু'জন, এই পাঁচজনে যে পঞ্চায়েৎ হয়েছে সেই পঞ্চায়েতে দো-সীমানার পুকুরের মাছের ভাগ নিয়ে ধীরু গাঙ্গুলী আর পশু হালদারের সাত আট বছরের পুরানো লাঠালাঠির মামলাও মীমাংসা করা হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষই খুশী হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। নীলু দাস তা'র মেয়েকে গা সাজানো গয়না দিতে পারে নি, এই রাগে তার বেয়াই ঝড়ু-মাহিন্দি ছেলের বউকে ঘরে আনতো না, ঐ পঞ্চায়েৎ এই মামলাও মিটিয়ে দিয়েছে। এর ফলে শুধু হাতকাঁদা রূপপুরই নয়, দশ বিশখানা গ্রামের মাতব্বর মাতব্বর, ভারিখি ভারিখি লোকেরাও আমাদের সঙ্গে আলাপ সালাপ ভাব ভালবাসা করবার জন্যে আসছেন। শোন গো ভাই, আমি গর্ব্ব করবার জন্যে বলছি নে, বাড়িয়েও বলছি নে, সত্যিই বুঝতে পারছি যে, সেই তল্লাটে বেশ একটা সোরগোল পড়েছে। নিস্তারিণী বাগদিনী বাজ যক্ষ্মায় ভুগে রক্ত উঠে মারা গেছলো। পাড়া এক দিন নড়া ওঠে নি, কেউ ছোঁবে না, রক্ত উঠেছে, বাপ্‌রে বাপ্‌, আস্ত কেউটে সাপ! পরের দিন খবর পেয়ে আমাদের শিবিরের লোকেরা "ভগবান মঙ্গলময়" ধ্বনি দিতে দিতে বালুডাঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে নিস্তারিণীকে দাহ করলে। তার পর থেকে একটা মজা হোল। মজাটা কি রকম জানেন? বিশ ত্রিশ ক্রোশ দূরেরও—কোন আত্মীয়বন্ধু নেই, পয়সা কড়ি নেই, নিয়ে যাবার লোক জুটছে না—এ রকম লোক মরলে আমাদের শিবিরে খবর আসতো, বে-ওয়ারিশ লাস পোড়াতে বা মাটি দিতে হবে। আমরা এটাও চাইছিলাম। সেবা করা আমাদের কাজের অঙ্গ। যারা সেবা করতে জানে, তারা দিগ্বিজয় করতে পারে। সেবায় বশ না হয় কে?

মন কিনতে সেবা অমূল্য ধন। এই সব কারণে আমাদের শিবির তল্লাটের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু মুশকিল হোল, সমবায় পদ্ধতির কথা বোঝাতে গিয়ে। যদু দাসের চাষের জমি তিন বিঘে, দুঃখীরাম দাশের দশ বিঘে, নন্দ মণ্ডলের তেরো বিঘে—এ তারা এক করবে কেন? এক করলে ত কারও খুব লাভ, আর কারও লোকসান—বেশীর ভাগ লোকেরই ভয়ানক লোকসান হবে। যদু দাসের তিন বিঘের ধান যদু পায় মেরে কেটে ত্রিশ মণ—বত্রিশ মণ, আর নন্দ মণ্ডল তেরো বিঘেতে একশ ত্রিশ-চল্লিশ মণ ধান পায়। আমাদের শিবিরের সমবায় দুর্ব্বুদ্ধিতে রাজী হলে ত নন্দ মণ্ডল মারা যাবে। নন্দ মণ্ডল চটে মটে লাল। আমাদের চেহারাগুলো ভালমানুষের ছেলের মত, কিন্তু পেটে পেটে এমন দুষ্টু বুদ্ধি। বটে!

পাঁচ সাত দিন লেগে গেল তাদের বোঝাতে যে, তিন বিঘের মাঠ, তের বিঘের মাঠ, পনেরো বিঘের মাঠ ভাগ থাকলে কোন কালে চাষের উন্নতি হবে না, চাষের কাজে বিজ্ঞানকেও লাগানো যাবে না; ফসলও বাড়বে না, আমাদের দেশের দৈন্যের দশাও ঘুচবে না। যদু দাস মশাইকেও তিন বিঘে জমি গবর্ণমেন্টকে বেচতে হবে, পাঁচু পাটারীর পঁচিশ বিঘেও গবর্ণমেন্ট কিনে নেবেন। নন্দ মণ্ডল মশাই যা ভাবছেন, তা'ও নয়; সব জমির মালিক হবেন, একমাত্র গবর্ণমেন্ট। তল্লাটকে তল্লাট তামাম্ মাঠ কিনে নিয়ে সমস্ত আল্ ভেঙ্গে হাজার দেড় হাজার বিঘের এক একটা মাঠ করে তার উপর কলের লাঙ্গল, কলের মই চালাবেন। কলের ধান কাটা, কলের পাট কাটা ব্যবস্থাও আস্তে আস্তে গবর্ণমেন্টই চালিয়ে দেবেন।

এই সব শুনে "তবে আমাদের কি হবে?" ব'লে গ্রামের লোকেরা যখন ভয়ে শিউরে উঠছিলেন, তখন আমরা তাঁদের বুঝিয়ে দিলুম, ভয় পাবেন না, মশাইগণ, ভয় পাবেন না। গবর্ণমেন্ট মানে হাতি ঘোড়া একটা কিছু নয়; গবর্ণমেন্ট মানে দৈত্য দানাও নয়। গবর্ণমেন্ট মানে, আপনি ও আমি। গবর্ণমেন্ট নগদ টাকা দিয়ে জমি

কিনে নিয়ে গ্রামের লোককেই ফিরিয়ে দিবেন, সকলে মিলে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করার জন্যে। আপনারা চিরদিন চাষ করেছেন তখনও করবেন, গ্রাম চিরদিন আপনাদের, তখনও থাকবে আপনাদের। উড়ে এসে কেউ জুড়ে বসবে না, আপনাদের বাড়া ভাতে কেউ থাবা মারবে না।

তবে তফাৎ একটু হবে বৈ কি। ছোট্ট ছোট্ট চাষী লোপ হয়ে সমবায়ে—অর্থাৎ কি-না সকলে মিলে বড় চাষী হতে হবে। সমবায়ের সমস্ত সভ্যকে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে সমস্ত জমি চাষ করতে হবে; আবার ফসল উঠলে মিলে মিশে ভাগ যোগ ক'রে নিতে হবে। ধান বলুন, মুগ কলাই বলুন, পাট বলুন, সর্ষে তিসি বলুন, সমবায় ভাণ্ডারে জমা হবে, সমবায় ভাণ্ডার থেকে ভাগ হবে, উদ্বৃত্ত যদি হয়, সমবায় ভাণ্ডার থেকেই বিক্রি করা হবে, আবার বীজ রাখবার ব্যবস্থা ঐ সমবায় ভাণ্ডারই করবে।

শেখ লালচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি আমাদের কারও কারও খুব লোকসান হবে না? সমবায় হলে ত সকলের সমান ভাগ হয়ে যাবে অথচ এখন আমার নব্বই বিঘে জমির উপস্বত্ব ত আমি একলাই পাচ্ছি, আমার বিলক্ষণ লাভও হচ্ছে। সমবায়ে ত আমার লোকসানই দেখতে পাই।

আমাদের শিবিরের সরোজ দা' বললেন, আপনার যে নব্বই বিঘে জমি, আপনি ত সেই নব্বই বিঘের নগদ দাম গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে গোড়াতেই পেয়ে গেলেন মশাই। সেই একগাদা নগদ টাকাটা বুঝি কিছু নয়? সেই টাকাটা দিয়ে আপনি শিল্প কাজ করতে পারেন, কলকারখানা গড়তে পারেন, বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দিতে পারেন, যা খুশী, যা ভাল বোঝেন, আপনি তাই করতে পারেন, তাতে ত কেউ হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে না। আপনি যে বড় লোক, সেই বড় লোকই থাকবেন।

যদু ঘোষ বললেন, আমার জমি ত মোটে তিন বিঘে।

সরোজ দা' বললেন, আপনি তিন বিঘের যা মূল্য, নগদে তাই

পেয়ে গেলেন। তারপর সমবায়ে চাষবাস সুরু ক'রে দিলেন। তার সঙ্গে পুরোনোর কোনও সম্পর্ক থাকলো না। সমবায়ে লালচাঁদ শেখও যা, যদু দাশও তাই।

লালচাঁদ শেখ অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন, বুঝেছি এর পর থেকে মুড়ী মিছরি এক দর হবে।

সরোজ দা' বললেন, না, না, তা নয়। সমবায় মানে হচ্ছে এই যে, হয় সকলেই মুড়ী খাবে, না হয় সকলেই মিছরি খাবে। কেউ যে রসগোল্লা গিলবে, আর কেউ শুধু খাবি খাবে, এ অনিয়ম আর থাকবে না।

প্রায় পনেরো দিন ধরে তর্ক বিতর্কের পরে এক দিন সভাশেষে সকলে চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, হরি হরি বল, ভাই হরি হরি বল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হরি ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। সমবায়ের বাঘ ঘাড় মটকাবে না এইটে বুঝতে পেরেই সেই হরিধ্বনি। হরি হরি বল ভাই, হরি হরি বল। লালচাঁদ শেখও বোধ করি তাঁদের সঙ্গে চীৎকারে যোগ দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য হলপ ক'রে বলতে পারি নে; কিন্তু মনে হোল, তাঁরও গলা শুনেছিলুম। তবে এটা ঠিক, ধর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া এ মুল্লুকে কেউ করে না। এখানে ইস্‌লাম ডেঙ্গারে পড়েনি। মনে মনে একটু আধটু চিড় খেলেও বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। মাত্র পাঁচ ছ' ঘর মুসলমান, শ' দেড়শ' ঘর হিন্দু, পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করবার দুর্বুদ্ধি হয় নি।

৫

ঘুরে ফিরে, আমি আজ আবার সেই পল্লী গ্রামের মাছের কথা বলছি। এই ত ছোট গ্রামখানি, কুড়ি ঘর লোকের বাস আছে কি না সন্দেহ কিন্তু পুষ্করিণী খুব কম করেও অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশটি হবে, আছে। আর খানা ও ডোবা? সে শটকে ছাড়িয়ে সহস্রকিয়ায় ঠেকলেও ঠেকতেপারে ব'লে মনে হচ্ছে। পুষ্করিণীগুলো কিন্তু 'ভাল'; বর্ষার জলে ভরে, গ্রীষ্ম কালের কড়া রৌদ্রে শুকোয়, পানা আর

আগাছার বংশ বৃদ্ধি হয়। কে একজন সন্ন্যাসী সেকালে ভরা নদীর বুকের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে গেছলেন, তাঁর পুণ্যির জোরে তিনি যেখানটা পা ফেলেন, সেইখানেই পদ্ম ফুটে ওঠে। আমাদের এই পুকুরগুলোতে পদ্ম ফোটবার আর দরকার নেই, রকমারী পানা আর আগাছার কার্পেটের প্লাটফর্ম্ম বানিয়ে রেখে দিয়েছে, বোধ হয় হেঁটে যেতে পারা যায়। গ্রামের লোকদের এমন সময় নেই যে, পানা তুলে সাফ করে। ডাঙ্গার কাছে পাঁচ সাত হাত জলের পানা সরিয়ে, বাঁশ দিয়ে একটু খানি জায়গা ফাঁক করে রাখে, সেইখানেই স্ত্রীপুরুষে গা ধোয়, কাপড় কাচে, হুস হুস ক'রে ডুব ফোঁড়ে, আর কোঁ কোঁ ক'রে জ্বরে ধোঁকে। আর মাছ? অভাব কি? চীনদেশে ও ফরাসীদেশে যে মাছ উপাদেয় খাদ্য, সেই দাদুরীকুল দিন রাত ঝপ্ ঝপ্ ক'রে লাফাচ্ছে আর ক্যাকর-কোঁ ক্যাকর-কোঁ করে গ্রাম মাতাচ্ছে। এ মাছ ফেলতে হয় না, এ মাছকে খাবার খাওয়াতে হয় না, খেলা দিতে হয় না, এরা নিজেই জন্মায়, নিজেই বাড়ে, নিজেরাই বংশের শ্রীবৃদ্ধি করে।

বৃথাই আমরা কেঁদে কেঁদে বাড়ী বাড়ী সেধে সেধে বেড়াচ্ছি, ঘুম কি কারও ভেঙ্গেছে, আলস্য কি একটুও ঘুচেছে? উৎপাদন বাড়াও, পণ্য বৃদ্ধি করো ব'লে এত বকে মরছি, একটা কুমড়ো কি কেউ বেশী ফলিয়েছেন? একটা পুকুর সাফ করে একজন লোকও কি এক হাঁড়ি পোনা ফেলেছেন? তবে হ্যাঁ, আমরাও ছাড়ছি না। ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকবো, কাজ করিয়ে তবে ছাড়বো। তাঁরা না করেন, তাঁদেরই হ'য়ে আমরা করবো। দশখানা গ্রামের লোকের হাতে ধ'রে ভিক্ষা চেয়ে বলবো, আমরা ক'রে দিয়ে যাই—আপনারা ভোগ করুন, তাতে আমাদের দুঃখ নেই।

আমাদের এই পল্লীগ্রামে খবর পৌঁচেছে যে ক'দিন ধরে কলকাতার বাজারে বাজারে ভীষণ মৎস্য বিভ্রাট চলছে। মাছের দাম আর সোনার দাম নাকি এক। আমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত হয়ে গেছি, মাছেরও দাম জানি নে, সোনার দামেরও খবর রাখি নে।

আমাদের নতুন বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোন দিন দয়া ক'রে যদি একটু আধটু চিংড়ীর গ্র্যাণ্ড চিলড্রেন বা বেলে টেংরে মাছ টাছ দেয় তবেই আমাদের পাতে সেদিন আঁসটে জিনিষ পড়ে, নইলে আমরা ত বুদ্ধদেবের মত কিম্বা গান্ধী মহারাজের মত "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" হয়ে গেছি। খুব যে কষ্ট হয়েছে মাছ না পেয়ে, তা'ও নয়: দিব্যি দু'বেলা বেশ ত চলে যাচ্ছে। সাধে কি আর বুড়ো গোপাল খুড়ো হরবখ্‌ত শেখান—

অভ্যাসের নাম মহাশয়,
যা সহাবে তাই সয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে কলকাতায় মাছের টানাটানিই বা হয় কেন, দামই বা পাঁচ সাত গুণ বাড়ে কেন, তা'ত বুঝি নে। কলকাতার নোংরা জল যেখান দিয়ে বার হয়ে যায়, সেই জায়গাটা কি আপনারা কেউ দেখেছেন? দেখেন নি। দেখে এলে ভাল করবেন। ভেড়ির নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনারা। মাছের ভেড়ি সব সেইখানে। কিন্তু সে ক'টা ভেড়ি? সেই রকম হাজার হাজার ভেড়ি বাঁধা হয় না কেন? জায়গার ত অভাব দেখি নে। তবে হয় না কেন? "এগ্রি-ফিস্‌রিজ" দপ্তর ত বিশ ত্রিশ বছর ধরেই ছিল, সচিব, পার্ষদ, সহায়, সম্পাদক, অনুষ্ঠানের ক্রটী আগেও ছিল না, এখনও নেই। তবুও, হয় নি কেন? এখনই বা না হয় কেন? ইংরেজ করতে দেয় নি? মিছে কথা। আমি বিশ্বাস করি নে। 'ক' অক্ষর গো অথবা শূকর মাংস মিনিস্টাররা বসে বসে মাইনে খেয়েছে আর মজা মেরেছে, কার দায় পড়েছে মাথা ঘামাতে—কার দায় পড়েছে পরিশ্রম করতে। অতীত—সে যাক্ গে, মরুক্ গে, আজকের কিয়া হাল। ফিস্‌রিজ দফতর কি কোনও কালে একটুও কষ্ট করবেন না? "সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না?" কলকাতার ছেলেরা আর কতকাল দরখাস্ত বগলে অফিসের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবে? খালি পেটে নিঃখরচার কলের জল গিলে, চীনে বাদাম চিবিয়ে, সিনেমায় ঢুকে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার বিভোর হয়ে থাকবে

আরও কত কাল? হ্যাঁগা, কেন তা'রা জলে কাদায় নামবে না, আমাদের মতন? এই ভেড়ীর পাশে পাশে, মরা নদী বিদ্যেধরীর ভরাট বুকে আশু ধানের ও আলুর চাষ কর'লে সোনা, সত্যি বলছি, সত্যিকারের সোনা ফলবে। আমার কথা যাঁরা শুনছেন বা পড়ছেন, তাঁদের আমি ঐ জায়গাগুলো দে'খে আসতে বলি। কলকাতার খুব কাছে, বেলেঘাটা নারকেলডাঙ্গা দিয়ে যেতে হয়। দেখবার মত জায়গা, ভাববার মত ও শেখবার মত জায়গাও বটে। সাধে আর নিশীথ মেতেছে।

কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগর কত দূর? আশী, নব্বই, এক শ' দেড় শ' মাইল হবে। এখান থেকে পুরী তিন শ' মাইল, কাঁথি মোটে এক শ' মাইল। ডায়মণ্ডহারবার থেকে খানিকটা দূর গেলেই ত বঙ্গ সমুদ্র। ঘরের এত কাছে মাছের সমুদ্দুর থাকতেও কলকাতায় মাছের দুর্ভিক্ষ হয় কেন? হ্যাঁ গা, আমরা কি বাঁশবনে ডোমকানা? বাঙ্গালীর লেখাপড়া-জানা সব ছেলেই কি অনন্তকাল ধরে শুধু হা চাকরী যো চাকরী করবে আর শান্তিদেবীর বরপুত্র হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে "অল কোয়ায়েট অন্ দি ক্যালকাটা ফ্রণ্ট" করবে? বলি হ্যাঁগা, দশটা ছেলেও কি ভ্যাগাবণ্ড নেই? আমাদের সবলদেহ, কর্ম্মঠ, শ্রমিক, ভীমসেন-মজদুর ভাইরা কি সবই কলকারখানায় কর্ম্ম পেয়ে কলের সাহেব, কলের বাবু, কলের কর্ম্মী হয়ে গেছেন? তাঁদের মধ্যেও বেকার কি কেউ নেই? কেন তাঁরা ক'খানা 'ট্রলার' ভাড়া করে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যান্ না? 'ট্রলার' না জোটাতে পারেন, সমুদ্রের দিশী-নৌকা ভাড়া করতেই বা দোষ কি? পুরীতে জালও পাওয়া যায়, স্বদেশী ন্যাসান্যাল 'ট্রলার'ও অজস্র মেলে, কালো কোলো নুলিয়াও অনেক আছে। এই নুলিয়ারা হচ্ছে, সাগর সন্তান। সাগরের বুকে কি কাণ্ডটা না করে এরা, মা—ছেলে সম্পর্ক না হ'লে, কবে একটি মাত্র আছাড়েই কর্ম্ম সাবাড় ক'রে দিতেন ঐ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বঙ্গ সমুদ্র। ওরা সাগর সন্তানই বটে।

আপনারা নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে পুরীতে পুরুষোত্তম দেবকে দেখতে গেছেন। আমি ভাই অনেকবার—বোধ হয়, একশ-এক বার—গেছি। হাত নেই, পা নেই, নাক থাঁদা, ঠুঁটো জগন্নাথ ঠাকুরকে আমার খুব ভাল লাগে, জগন্নাথের প্রসাদও আমার ভারি মিষ্টি লাগে, আর সমুদ্র স্নানে যে কি আনন্দ, সে কি বলবো? সত্যি, ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে নেচে স্নান করতে সকলেরই খুব আমোদ হয়। আপনাদেরও বোধ হয় তাই হয়।

সেখানকার নুলিয়ারা ছোট বড় হাজার হাজার নৌকো করে রোজ রোজ সমুদ্দুর থেকে গাদা গাদা মাছ ধরে। বড় বড় মাছ, ছোট ছোট মাছ, হাঙ্গর, কুমীরও ধরে, তবে মাছই বেশী। ধ'রে কতক বিক্রী করে, সামান্য কিছুটা খায় আর বাকীটা বালির নীচে পুঁতে রাখে।

"শুটকী" মাছ করে চালান দেবার জন্যে বালির নীচে মাছ পুঁতে রাখা হয়। দক্ষিণ ভারতে শুঁটকি মাছের মস্ত ব্যবসা। শুনেছি, ভারতবর্ষের বাইরেও শুটকি মাছ চালান যায়। ওটা নাকি একটা ভাল ব্যবসা। কিন্তু ভাই, কলকাতার লোক ও বাঙ্গলা দেশের নরনারী যখন মাছ খেতে পাচ্ছে না, মাছ না খেয়ে তাদের দেহের কষ্ট ও মনের কষ্ট—আহা, বড় কষ্ট।—তখন শুঁটকি মাছ করবার জন্যে বালির তলায় মাছ পোঁতা কি ভাল? না, মাছগুলো আমাদের পোড়া-কতক-ভাঙ্গা বরাতওলা লোকদের দিকে, অভাগা বঙ্গদেশের পানে চালান দেওয়া ভাল? আপনারা দশজন লোক মিলে আসুন আমার সঙ্গে। আমি ও আপনারা মিলে একখানা এরোপ্লেন ভাড়া ক'রে রোজ রোজ কলকাতার বাজার মাছে ভরিয়ে দিই না কেন? আমরা লাভও চাইনে, মুনফাও খুঁজিনে, কাজটা সুরু করিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা। আর তাও বলি, আমাদেরই বা যেতে হবে কেন? কলকাতায় কি মাথাওলা, পয়সাওলা, বুদ্ধিওলা মানুষ নেই? কলকাতায় কি কোটীশ্বরের অভাব আছে? মাছে মরেন এবং মাছে বাঁচেন এমন লোক ত কলকাতায় ও বাঙ্গলায় গিজ্ গিজ্ করছেন। এখন ত

নিজেদের গবর্ণমেণ্ট হয়েছে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের অনুমতি নিয়ে কয়েকজন লোক জয় রাম শ্রীরাম ব'লে সমুদ্রে নেমে পড়লেই ত পাবেন। অনুমতির জন্য ভাবনা করবার দরকার নেই। ভাল কাজে অনুমতি অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে আর কি। "যাব কি যাব না—মিছে এ ভাবনা—মিছে মরি লোকলাজে" না ক'রে "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাম" অথবা "রাম রহিম না জুদা করো ভাই—দিলকো সাচ্চা রাখো জী" ক'রে বেরিয়ে পড়ুন। মাছের দুঃখটা ঘুচবেই ঘুচবে। আর মাছ বেশী করে পেলে অন্যান্য খাবার জিনিষের ওপর টানও একটু একটু করে কমবে বলে আমি মনে করি। Produce or Perish।—উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে উৎসাদন। অন্য খাদ্য বাঁচাতে, আসুন-না, মাছটার আমদানীটাই বাড়িয়ে ফেলুন-না মশাই আপনারা।

৬

আর দু'তিন দিন পরেই পূজোর ছুটি সুরু। দুর্গা পূজার উৎসবটাও যেমন মস্ত বড় উৎসব, ছুটিটাও তেমনি মস্ত বড় ছুটি। এবার আবার ঐ সঙ্গে ঈদ পড়েছে। আলাদা ঈদ হ'লে আলাদা ছুটি হোত, এবারে এক হয়ে গেছে। পূ'জার ছুটিতে ছেলেরা দেশে যাবেন, বোধ হয় বৃদ্ধরাও যাবেন। আবার শ্রমিক মজদুররাও যাবেন। যাঁদের দেশ বা ঘর বাড়ী নেই, এ সময়টা তাঁদের ভারি মন খারাপ হয়। কেবল মনে হয়, আহা, আমার যদি একটি দেশ বা গ্রাম থাকতো। অনেকের আবার দেশ আছে, কিন্তু দেশে কোনও ঘর বাড়ী নেই। একদিন ছিল অবশ্য কিন্তু না যাওয়ায়, না দেখায়, অযত্নে পড়ে-ঝড়ে গেছে, তার জায়গায় এখন অজগর বন বাদাড় হয়ে আছে। আবার এমন লোকও আমরা দেখেছি, যাঁদের গ্রামও আছে, ঘর বাড়ীও যা-হোক তা-হোক্ রকমের একটু আধটু আছে কিন্তু পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া ও ঐ রকমের আরও যে সব রাক্ষস

রাক্ষুসী আছে, তাদের ভয়ে তাঁরা দেশ গ্রাম ও পিতৃ পুরুষের ভিটের নামেই আঁৎকে ওঠেন, যাবার কথা বললে, "বাপরে" ব'লে তুড়ি লাফ্ মারেন। বলেন, সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, বেশ আছি। এতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছেন, উভয়েই সমান অপরাধী। হিন্দুও পল্লী ভুলেছেন, মুসলমানও পল্লী ভুলে বসেছেন।

আমি আজ তাঁদেরই কাছে করযোড়ে আবেদন করবো, ঠিক যে ভাবে ভিক্ষে চাওয়া হয় সেই ভাবে হাত জোড় করে অনুনয় বিনয় করে বলবো, এই পূজোর ছুটিতে—ঈদের সময়ে—একটি বার গ্রামে যান, একবার দেখে আসুন। সাবধান হয়ে গেলে এবং সেখানে গিয়ে সাবধানে থাকলে ম্যালেরিয়ার খর্পরে না পড়তেও পারেন। একটি বার দেখে আসা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া, গ্রাম-ছাড়া, ঘরবাড়ী-ছাড়া, প্রবাসী লোকগুলির নাম ঠিকানা যোগাড় করাও দরকার। নাম ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা অন্য রকমে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে, গ্রামের বন বাদাড় সাফ করা যায় কি না, জঙ্গল জাঙ্গাল পরিষ্কার ক'রে ফেলা সম্ভব কি-না, ঘরবাড়ী সারিয়ে সুবিধে বাসের মত করা চলে কি-না, ছোটখাট চালা টালা তোলা সম্ভব কি-না, পতিত জমিতে লাঙ্গল লাগিয়ে, মই চালিয়ে, চাষ করা সম্ভব হয় কি-না, হাজা, মজা পুকুর ডোবা গুলো কাটানো ও ঝালানো যায় কি-না, ঝালিয়ে তাতে মাছ ফেলা যায় কি না, কিম্বা গ্রামের লোককেই মাছের বন্দোবস্ত দেওয়া যায় কি-না—এইগুলো বিচার বিবেচনা ক'রে দেখবার আজ বিশেষ দরকার হয়েছে। সহরে বাস করবো, চাকরি-বাকরি করবো, আর রেসনের ঐ ছাই পাঁশ গিলবো এই ভাব আর বেশী দিন বজায় থাক্‌লে বাঙ্গালী জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, কি হিন্দু কি মুসলমান পশ্চিম বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে কি-না খুব সন্দেহ। আর, ভাই, তাও বলি, সহরের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। সহরে থাকবে, খুব বড় লোকেরা, আর থাকবে, খুব গরীবেরা। মাঝামাঝি লোকের ঠাঁই সহরে হবে না, এ একেবারে খাঁটি সত্যি

কথা। 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙ্গলো বলে, তার আর বেশী দেরী নেই। "পল্লী চলো, পল্লী চলো, পল্লী চলো ভাই" রব উঠলো বলে, দেখে নেবেন আপনারা। ভাল কথা, আমাদের 'নির্ম্মল অপেরা পার্টি' খোল করতাল শাঁক শিঙ্গে কাঁসর ঘটা নিয়ে গ্রামে গ্রামে খুব হৈ হল্লা ক'রে কীর্ত্তন ক'রে বেড়াচ্ছে।

কখনও রেলগাড়ী ক'রে, কখনও গরুর গাড়ী চ'ড়ে, কখনও বা নৌকো ক'রে, কখনও বা খুট্ খুট্ খুট্ চরণ বাবুর জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে আমি পশ্চিম বাঙ্গলার অনেক গুলো জেলা ঘুরে বেড়িয়েছি। হুগলীতে আমার নিজের 'দেশ" --হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, চব্বিশপরগণা, নদীয়া সব ঘুরেছি, দেখেছি—একেবারে শ্মশানের মত নির্জ্জন। এই শ্মশানকে আবার মানুষের বাসভূমি করতে হবে। বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম একদিন সুন্দর তপোবন ছিল, আবার সেই নন্দন তপোবন ক'রে তুলতে হবে। তুলতে হবে এবং সে আমাদেরই ক'রে তুলতে হবে, পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশ, তার গবর্ণমেণ্টের পানে বা অন্য কারও পানে হাঁ করে চেয়ে থাকে না। স্বাধীন হয়ে আবার পরাধীন হবে কেন? স্বাধীন জাতি পরমুখাপেক্ষী হ'তে চায় না, হতে তাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। স্বাধীন মানে স্ব-অধীন—নিজের অধীন। নিজের ছাড়া আর কারও অধীন সে হতে চায় না। স্বাধীন দেশের লোকের মনে ঐ গর্ব্বটা—স্বাধীনতার গর্ব্বটা খুবই বেশী।

ইংরেজ প্রায় দু'শ বছর আমাদের নাবালক ক'রে রেখে দিয়েছিল, তা ঠিক। দশটা ছেলে মিলে যদি একটা কুস্তির আখড়া করতো, ইংরেজ মনে ভয় করতো, ছোঁড়াগুলো ঐ 'গুলি' পাকাচ্ছে, ঐ মাসকেল ফোলাচ্ছে, বুঝিবা তাদেরই তাড়াবার জন্যে। পুলিসের গোয়েন্দা টোয়েন্দা টিকটিকি গিরগিটি লেলিয়ে দিত, আখড়া ভেঙে দিত। পল্লীগ্রামে কিছু করতে গেলেও সন্দেহ করতো, ঐ রে, বুঝি নির্জ্জন জায়গায় বসে বোমা তৈরী করছে। এই রকম সব কাজেই সন্দেহ করতো, বাধা দিতো! বাধা পেয়ে পেয়ে আমরাও

কিছু না স্থাবর ও অকর্ম্মণ্য বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করতুম। কিন্তু আজ তো আর ইংরেজ রাজাধিরাজ হয়ে মাথার উপরে বসে নেই। আজ প্রত্যেকটি ভাল কাজ করবার স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। যে কোন কাজের দ্বারা দেশের উপকার হবে, সেই কাজই দেশের কাজ, সেই কাজই করবার ভার আমাদের প্রত্যেকের ওপর। মানুষে এ ভার না দিতে পারে, স্বয়ং জননী জন্মভূমি এই ভার দিয়েছেন। আপনাদের কারও বুড়ো মা যদি দেশে বাস ক'রেন তাহ'লে সেই মা যেমন প্রবাসী ছেলের মুখখানি বুকে ধ'রে দেশে পড়ে থাকেন, প্রত্যকটি কাজে বিদেশবাসী ছেলের ভরসা করেন, আমাদের জননী জন্মভূমিও ঠিক সেই রকম সহরবাসী সন্তানের ভরসায় সেই বনে বাস করছেন, জন্মভূমি মারও সেই ভরসা—ছেলেরা আবার আসবে, আবার বাস করবে, আবার মা ব'লে ডাকবে, মা'র সেবা করবে।

আজ সব কাজের চেয়ে পল্লীগঠনের কাজই বড়। পল্লীতে খাদ্য উৎপন্ন হয়, পল্লীতে ডাল, পল্লীতে পটল, পল্লীতে আলু, পল্লীতে ঝিঙ্গে উচ্ছে, পল্লীতে মাছ ; পল্লীতে ডাব, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল ; পল্লীতেই শাক শব্জী। সহরে বড় বড় গোল গোল চৌকো চৌকো লম্বা লম্বা ঘোড়ার ডিম্ব ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। সাদা কথায় ভেবে দেখুন, পল্লীগ্রামই মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে কি-না। পরিয়ে? হ্যাঁ তা বৈ কি। তুলোর চাষও পল্লীগ্রামেই হয়। আমরা বাঙ্গালীরা তেল মাখি। তেলের কল সহরে থাকতে পারে, সরষে, তিল, মসনে, তিসি, নারকেল সবই পল্লীগ্রামে। তেলে-জলে বাঙ্গালীর শরীর, তা স্বীকার করেন ত? ও দু'টো জিনিষই পল্লীগ্রামে। ঘানির তেল মেখে পুকুরে বা নদীতে অবগাহন স্নান ক'রে এক পাথর মোটা ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত গিলুক তো দেখি বাঙ্গালী আবার।

ইংরেজ বাঙ্গালীকে নন্ মার্শাল রেশ' 'যুদ্ধ-অক্ষম জাত' বলে লিখে রেখে গেছে। মিথ্যে কথা, ভয়ানক মিথ্যে। বাঙ্গালী

প্রতাপাদিত্যের নামে দিল্লী কাঁপতো, বাঙ্গালী বার ভুঁইয়ার ভয়ে বঙ্গসাগরে দস্যুদের—বোম্বেটেদেব হাডেব ভেতরও কাঁপণ ধরতো। বেশী দিন নয়, পাঁচ সাতটা বছব বাঙ্গালীব ছেলে পেট ভ'রে ভাত ডাল মাছ খাক্, বগড়ে রগড়ে গায়ে সর্ষেব তেল মাখুক আব নদী তোলপাড ক'রে স্নান করুক, আবার প্রতাপাদিত্য, মোহনলাল মেলে কি না দেখি আমি। ঘবে ঘরে আশানন্দ ঢেঁকি জন্ম গ্রহণ ক'বে শত্রুকে ঢেঁকি পেটা না কবে ত আমি কি বলেছি'

আসল কথা হচ্ছে কি জানেন? কলকাতায ব'সে বা দাঁড়িয়ে বক্তৃতাব তুবড়ি ফুটিয়ে পল্লী সঙ্গঠন কবতে চাইলে আবার সেই বৃহৎ বৃহৎ অশ্ব-ডিম্ব হবে। যুদ্ধেব সময়ে কলকাতাব একটা সাহেব-হোটেলে ছুরি কাঁটা চালিযে মুর্গিব ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে 'গ্রো মোব ফুড ক্যাম্পেন্" খোলা হয়েছিল। অল্প ক'রে কয়েকটি কোটী টাকা হাত বদল হোল শুধু—শূন্যে মিলিযে গেল, পাখা নেড়ে উড়ে গেলো—আব ফুড গ্রো কবলো গোবরে।

এই সামনেব পূজোর ছুটিটা পল্লীগ্রাম পরিদর্শনের কাজ ক'রে আসুন আপনারা। আমাদের মত বাবু ভাযারাও যান, জোযান জোযান ছেলেবাও যান, শ্রমিক মজুব ভাই ব্রাদাররাও যান। তারপব, আপনাবাও ঠিক আমাদেব মত "জয পল্লীরাণী" বলে বেবিযে পড়বেন, পড়তেই হবে—নিশ্চয নিশ্চয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি কবে বাখলুম। মিলিযে নেবেন।

আমাদেব সুন্দবী শিবোমণি নগবীরাণী কলকাতা আর নাকি ভাব বইতে পাবছেন না। কুঁচকিকণ্ঠা ঠাসা বোঝাই মোষ বা গরুর গাড়ীব ভাবে মোষ ও গরু জোয়াল ছেড়ে বেবিযে এসে ঘাড বেঁকিয়ে বিদ্রোহ কবে, আপনাবা নিশ্চযই এই দৃশ্য দেখেছেন। গাড়োয়ান ছপাৎ ছপাৎ ক'বে ছিপটি, ধপাস ধপাস ক'রে লাঠি পিটছে। জীব দুটি দমাদ্দম মাব খাচ্ছে, ঘাড় গুঁজে শিং বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে চোখের জল ফেলছে, ফোস্ ফোস্ ক'রে নিঃশ্বেস ফেলছে, তবুও জোয়াল ঘাড়ে নেবে না।

কারণ, তত ভারি বোঝা বইতে পারছে না। কলকাতারও নাকি সেই অবস্থা হয়েছে! কলকাতা আর পারছেন না। শ্রীমতীর ঘাড়ে যুদ্ধের সময থেকেই বোঝা চাপতে সুরু হয়েছিল। যুদ্ধ থামলো, কিন্তু বোঝাও নামলো না, ভারও কমলো না। আবাব এমন এক 'অদৃশ্য যুদ্ধ' সুরু হযে গেছে যে, তাঁর ঘাডেব 'লোড' এমনই গুরুতর হযে উঠছে যে, সুন্দবীর নাভিশ্বাস আবস্ত হযেছে। বাঁচে কি বাঁচে না—এখন তখন ভাব। পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে, মামদোব ভযে হুড হুড ক'রে লোক কলকাতায চলে আসছেন। ভয সত্যি, না, মিথ্যে ভয তা ভাববারও সময় নেই, ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই যেমন ল্যাজ উঁচু ক'রে ছোটে, পূর্ব্ব বঙ্গের লোকও তেমনই ছুটছেন।

সপ্তাহে সপ্তাহে ত্রিশ পঁযত্রিশ হাজার নবনারী কলকাতাব স্কন্ধে আবোহণ করছেন। অবস্থা কাহিল—ব্রেক ডাউন, ভেঙ্গে পড়ে পড়ে। কিন্তু যারা আসছে তাদের "না" বলতে পাবে এমন কঠিন প্রাণ লোক বোধ করি নেই। আর "না" করলেই বা শুনবে কেন? তারা আসবেই।

তাই কিছুদিন ধবে নানান জন, নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। রোগ জটিল ও অবস্থা সঙ্গীন হলে তা বড ত' বড ডাক্তাব বদ্যিব দবজায় দবজায় যেমন ঘুরতে হয, ঠাকুব দেবতা, মাদুলী, তাগা তাবিজেরও তেমনই সন্ধান করা হয়। কেউ বলছেন শ্যাটিলাইট্ সহর তৈরী করা হোক; কেউ বলছেন, ঘাড ধ'রে ধ'রে সব লোককে গ্রামে পাঠিযে দাও, আর সহরতলীর রেলগুলোকে বিদ্যুতে চালাও—বোম্বাইয়ের মত, লোকগুলো ঝপাঝপ ইলেকট্রিক ট্রেন চড়ে গ্রাম থেকে সহরে ও সহর থেকে গ্রামে আনা গোনা করুক। কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন, কলকাতাটাকে বাড়িয়ে ফেল না বাপু। পশ্চিম-দিকে গঙ্গানদী, ওদিকে ত পা বাডাবার উপায় নেই; অন্য তিনটি দিকেই নগরীটিকে না-হয় বাড়িয়ে যাও না বাপু!

এ্যাং যায় ব্যাং যায়, দেখে দেখে খলসে বলে আমিও বা না

যাই কেন? আমিও একটা পরামর্শ দিয়ে ফেলি। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্য্যন্ত, আমারও দৌড় আপনারা পর্য্যন্ত। পরামর্শটা আমি আপনাদের সঙ্গেই করবো। আমি, শ্রমিক মজদুরদের অসীম শক্তিশালী ব'লে জানি, শ্রমিক মজদুররা অসাধ্যসাধনক্ষম তা আমি মানি। আমি কায়মনে বিশ্বাস করি, আমাদের এই দেশকে বড় করবার, ধনশালী করবার, সমৃদ্ধ করবার, সুন্দর ভারতবর্ষকে সুন্দরতম করবার যোগ্যতা তাঁদেরই আছে, তাঁরা বড় কাজ করতেও পারেন, আবার বড় বড় কাজ তাঁরা করাতেও পারেন। তাঁরা যা চাইবেন, তাই হবে, তাঁরা যা করতে বলবেন, রাষ্ট্রও তাই করবেন। তাঁরা হ'লেন দেশের মেরুদণ্ড।

আমি বলি কি, দেশে চলাচল ব্যবস্থা নেই, সকলের আগে চলাচল ব্যবস্থা খুলে দেওয়া হোক। দেশে রাস্তা নেই বললেই হয়। ইংরেজ প্রায় দু'শ বছর সাম্রাজ্য করে গেছেন, সোনার ভারতবর্ষের দৌলতে বিলেতটাকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে, পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজ জাতি গণনীয় মাননীয় হয়েছিলেন কিন্তু আধ মাইল লম্বা একটি রাস্তাও কি রাজস্বের টাকা থেকে ইংরেজ মহারাজ এই দেশে তৈরী করিয়ে ছিলেন? না, একটিও না।—রাস্তা অর্থাৎ রাজপথ হচ্ছে দেশের প্রাণ। রাস্তা দেখেই দেশের অবস্থা ভাল কিম্বা মন্দ, দেশ উত্তম অথবা অধম, দেশ সমৃদ্ধ বা দেশ দরিদ্র তা অনায়াসে বোঝা যায়। শুধু কি তাই? গ্রাম গ্রামান্তর পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা থাকলে খাবার দ্রব্য হোক, অন্য জিনিষ হোক, আমদানী রপ্তানী ক'রে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে লোকে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে। আবার গ্রামে যে যে জিনিষের দরকার তা'ও আনতে হ'লে রাস্তা ছাড়া তার অন্য কোনও উপায়ই নেই। কলকাতা থেকে মাত্র ছাব্বিশ মাইল দূরে আমরা একদিন একটি গ্রাম দেখতে গেছলুম। রাস্তাও নেই, ঘাটও নেই, গাড়ীও নেই, ঘোড়াও নেই। আমার সেই ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্ট, আদি ও অকৃত্রিম স্বদেশী যান—গো রথে খানিক, শ্রীচরণবাবুর জুড়িতে চ'ড়ে খানিক, জুতো পায়ে খানিক, জুতো হাতে খানিক,

কাপড়ের কোঁচা উঁচু করে খানিক, কোঁচা কোমরে তুলে খানিক, এই রকম করতে করতে আমরা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত। চার পয়সা ক'রে দেড় গ্লাস জল ভরা ডাবের জলে আকণ্ঠ উদর পুরিয়ে, চার আনা সের বেগুণ, তিন আনা সের ঝিঙ্গে ও আট আনা সের ছানা কিনে ত্বর আগে পুনরাগমন কলকাতায় একটা ডাব চার আনা, বেগুণ একটাকা, ঝিঙ্গে আট আনা সের। সেখানকার লোকে প্রাণ ভ'রে ডাব ও তরি তরকারী খেতে পান, তা সত্যি, কিন্তু ওগুলো বেচে নগদ পয়সা রোজগারও হয় না, অন্য জিনিসও পাওয়া যায় না। কিন্তু রাস্তা থাকলে ও দুটি কাজই হতে পারতো।

চারদিকে বন বাদাড় অন্ধকার করে রেখে দিয়েছে, পতিত জমিই কি কম পড়ে আছে? কোথায়ও খানিকটা ঝোপ জঙ্গল, কোথায়ও কতকগুলো বাবলা গাছের সারি আর কুকুর শোঁকার গাছ ও বন্যলতা। কেউ ফিরেও চায় না, দেখেও দেখে না। কিন্তু একটা লম্বা টানা রাস্তা তৈরী করা হোক ত, সঙ্গে সঙ্গে হতশ্রী গ্রামের শ্রী ফিরে যাবে। পাখী যেমন ঠোঁটে করে কুটো নাটা নিয়ে গিয়ে গাছে বাসা বাঁধে, এই মানুষ পাখীও-অমনি রাস্তার ধারে ধারে ইটের পরে ইট সাজিয়ে হোক কিম্বা কাদার দেওয়াল তুলে হোক দিব্য "নেষ্ট" বানিয়ে ফেলবে। কারও বক্তৃতা দেবার দরকার হবে না, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতে হবে না, রেডিয়োর "টক্" করতে হবে না, মানুষ ঝড়াঝড় বাসা বেঁধে গ্রাম, সহর, নগর, গঞ্জ, বন্দর ক'রে তুলবে, দোকান পশার, হাট বাজার জম জমাট হয়ে পড়বে —মানুষের কলরবে জম জম গম গম করতে থাকবে। আমার কথা সত্যি কিম্বা মিথ্যে তার প্রমাণ চান্? বেশ, প্রমাণ দিচ্ছি। একটা রেলের ইষ্টিশান অথবা জাহাজ ঘাটের কথা মনে করুন আর ভেবে দেখুন; 'পার্থসারথী' ঠিক বলছেন কি-না। গ্রাম নিশুতি, যেন শ্মশান, লোকের বাস আছে কিম্বা নেই, বোঝা দায়; কিন্তু ইষ্টিশান্টির কাছে যান, দেখবেন দোকানে দোকানে হুঁকোর ভড়াৎ ভড়াৎ আওয়াজ হচ্ছে; দোকানীতে খদ্দেরে দাম নিয়ে ওজন নিয়ে

নগদ কিম্বা ধার এই নিয়ে বচসা চলছে, তারই মাঝে ছেলে মেয়ের বিয়ের কথা, কুটুম্বিতার গল্প, রাজনীতির কাহিনী, সমাজনীতির কেচ্ছাও বেশ হচ্ছে। পৃথিবী যে অচল নয়, সংসার যে চলছে, মানুষ যে ম'রে ভূত হয়ে যায় নি তার এক হাজার এক শ এক রকম প্রমাণ একদণ্ডে পেয়ে যাবেন। কারণ ঐ আগেই বলছি, যেখানে চলাচল ব্যবস্থা, যেখানে "কমিউনিকেসান," সেইখানেই মানুষ। আর যেখানে মানুষ, সেই খানেই কাজ। যে দেশে চলাচল ব্যবস্থা ভাল ও বেশী—সে দেশ তত সমৃদ্ধ, তত উন্নত, তত ধনশালী। আমাদের দেশে চলাচল ব্যবস্থা নেই, তাই আমাদের দুঃখে আমরা ত কাঁদছিই, বেশীদিন আরও যদি এই রকম সুব্যবস্থাই থেকে যায়, আহা মরি মরি! রাস্তাঘাট চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি না হয়, তা' হলে, আমাদের দুর্দ্দশায় আমরা ত ছার, শেয়াল কুকুরও ভেউ ভেউ করে কাঁদবে।

এখন কথা, আপনারা কি করতে পারেন? আমি বলবো, সবই করতে পারেন। আমরা গ্রামের সব লোক মিলে খেটে খুটে খানিক খানিক রাস্তা নিশ্চয়ই করতে পারি। আমাদের উদ্যম ও উদ্যোগ দেখলে গভর্ণমেণ্টও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব'সে থাকবেন না, কারণ গভর্ণমেণ্টও ত আমরাই গো মশাই, আপনারাই।

আমাদের বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালীর গৌরবের কথা বলতে বলতে একটি গানের একটি ছত্রে বলেছিলেন:—

"একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়"। এর মানে একদিন বাঙ্গালীর জাহাজ ছিল। আর সেই জাহাজ ভারত মহাসাগরে ঘুরে বেড়াত। হাঁ। আমাদের দেশের বাণিজ্য জাহাজ চালাত। জাভা, জাপান, শ্যাম, মালয়, ব্রহ্ম, সিংহল, জাপান ও সুদূর চীন মহাদেশ পর্য্যন্ত আমরা পণ্য পাঠাতুম, সেখানকার জিনিষও এদেশে আনতুম। এটা হল বৈদেশিক ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা। আমাদের দেশের ভেতরকার বাণিজ্যও নৌকা করে চালানো হোত। সত্যনারায়ণের কথায় আপনারা নিশ্চয়ই

পুরুত ঠাকুরের মুখে বণিকের মাল বোঝাই সাত সাতটা ডিঙ্গা ডুবে যাওয়ার এবং সত্যপীরের দয়ায় আবার ডোবা ডিঙ্গার উদ্ধারের কাহিনী শুনেছেন। ছেলেবেলায় ঘুম পাড়ানো ও ছেলে ভুলানো ছড়ায় সাজান নৌকোর সুখ্যাতি কি আপনারা শোনেন নি নাকি? আমরা শুনেছি: বোন তার ছোট ভাইবোনকে ভোলাচ্ছে:

"এই নৌকা চড়ে দাদা বৌ আনবে কাল।"

আমাদের দেশকে আমরা নদী-মাতৃক দেশ বলি। নদী-মাতৃক মানে নদীগুলি যেন মা হয়ে আমাদের পালন করছেন, খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, মানুষ করছেন।

আমাদের এই পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথী নদীটির কথাই ধরুন না কেন। কোথায় কোন্ সুদূর দেশে, হাজার পনর শ মাইল দূরে গঙ্গার উৎপত্তি: একটি একটি করে চার চারটি প্রদেশের ভেতর দিয়ে ব'য়ে ব'য়ে মৃত্তিকা সরস করতে করতে বাঙ্গলা দেশের এক প্রান্তে এসে জাহ্নবী-গঙ্গা সমুদ্রে মিশে গেলেন। গঙ্গা নদীর জল হিন্দুর কাছে পবিত্র, স্বর্গ. হিন্দু এই জল পূজো করে, এই জল স্পর্শ করে ধন্য হয়, এই জলে স্নান করে পাপ বিমোচন করে, মরণের পরে দাহ হয়ে গেলে শেষ অস্থিটি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে ভাবে, পরলোকেও সদ্গতি হয়ে গেল। কেমন, এ ত আপনারা সকলেই জানেন। এ হল ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা, সে যাক। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাটি ভেবে দেখুন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙ্গলা এই চার চারটি প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ঐ একটি নদীর ওপর নৌকো ভাসিয়েই চলতো। পশ্চিম বাঙ্গলার প্রায় সকল জেলার মাল চলাচল গঙ্গা নদী দিয়েই হোত। ইংরেজের দেড় শ বছরের অবহেলায় সেই গঙ্গার আজ কি দুর্দ্দশা! আমাদের সে কালের 'ম্যাঞ্চেস্টার' মুর্শিদাবাদের কাছটায় লোকে এখন হাঁটুর উপর কাপড় তুলেই এপার ওপার যাওয়া আসা করে। আমাদের বাঙ্গলায় গঙ্গা ছাড়া আরও কত নদ নদী ছিল, জেলার ভেতর দিয়ে, গ্রামের ভেতর দিয়ে কুলু কুলু রবে ছোট্ট ছোট্ট ঝিক্‌মিকে চিক্‌মিকে ঢেউ

তুলতে তুলতে বয়ে যেতো ; নৌকোর মাঝিরা সারি গান গাইতে গাইতে, সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার গল্প করতে করতে, এখানকার পণ্য সেখানে, সেখানকার মাল অন্যখানে, এই করে বেড়াত।

নদীর ধারে ধারে একটা গঞ্জ বা বন্দর গ'ড়ে উঠতো। হাজারে হাজারে ঘর বাড়ী, শতকে শতকে দোকান পশার, খাবারের দোকান, খেলনার দোকান ব'সে যেতো, গঞ্জ গম্ গম্ করতো। আমার দেশের কাছে সপ্তগ্রাম নামে একটা জায়গা আছে। আজ যেমন আপনাদের কলকাতার ভারি নাম ডাক, ভারি পশার, একদিন সাত গাঁয়ের সেই রকম নাম ডাক, সেই রকম পশার ছিল। সপ্তগ্রাম ছিল মস্ত বড় বন্দর, তাই সেকালে সপ্তগ্রাম হয়েছিল বাঙ্গলার রাজধানী। হাজার হাজার নৌকো সপ্তগ্রামের বন্দর জম জমাট করে রাখতো। আজ সপ্তগ্রামের নদীতে পায়ের চেটো ডোবে না। ইংরেজের কি দয়া! শুধু কি সপ্তগ্রামের নদীর কথাই বলছি আমি, তা নয়, পশ্চিম বাঙ্গলার সমস্ত নদীর ঐ একই দশা। নদীর দুধারে নির্জন বন বাদাড়, শূন্য প্রান্তর ও ঘন জঙ্গল। আজ যদি একটা মরা নদীকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, একটা নদীকে স্রোতস্বিনী করা সম্ভব হয়, একটা নদীর বুকে হাঁসের ঝাঁকের মত নৌকোর ঝাঁক ভাসিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে নদীর দু'ধারে মরা জঙ্গল কেটে, বন বাদাড় সাফ ক'রে আপনা থেকেই জনপদ তৈরী হয়ে ওঠে। নদীর ধারে ধারে শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে, শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসও জমে ওঠে। ঘরবাড়ী তৈরী করে দিতে হয় না, মানুষ পক্ষী হয়ে পিঠে ক'রে ইট, মাথায় ক'রে খড়, কাঁধে ক'রে বাঁশ নিয়ে এসে নিজেরাই ঘরদোর তৈরী করে নিয়ে ব'সে পড়ে।

একদিকে রাস্তা আর একদিকে নদী সংস্কার, এই দু'টি হ'লে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রদেশ, অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গেও আমরা বহু অভাগা লোকের বসতির ব্যবস্থা অনায়াসে ক'রে দিতে পারি। রাস্তার ধারে ধারে অথবা নদীর তীরে তীরে দশ পনেরো মাইল অন্তর অন্তর এক একটা শিল্প কেন্দ্র বসিয়ে দিয়ে কুটীর শিল্প সুরু

ক'রে দিতে পারি। শিল্পকেন্দ্রের লাগোয়া লাগোয়া ভূখণ্ডে মানুষের বসতি বসে যেতে দিতে কারও আপত্তি হবে না। এক পাশে হবে শিল্প-গ্রাম, তারই আর এক পাশে হবে কৃষি-গ্রাম। যারা শিল্প কাজ করবে তারাই শিল্পগ্রামের ঐ সব বসতিতে ঘর বাড়ী বাসা বানিয়ে বাস করবে আর বাকী লোকগুলি নিকটবর্ত্তী কৃষি-গ্রামগুলিতে বাস ও চাস করবে। যারা শিল্পকেন্দ্রে কাজ করবে শিল্প নগরে তাদের জন্যে বাসস্থান তৈরী হবে, আর যারা তা করবে না, গ্রামে থেকে তাদের চাষের কাজই করতে হবে। রাস্তায় গরু বা মোষের গাড়ী অথবা নদীতে নৌকা বোঝাই দিয়ে তারা চাষে উৎপন্ন দ্রব্য সহরে বা শিল্পকেন্দ্রে পাঠাবে ও সহর বা শিল্পকেন্দ্র থেকে গ্রামের দরকারী জিনিষপত্র ঐ গাড়ী বা নৌকা ক'রেই তারা গ্রামে নিয়ে যাবে। ইউরোপে একে বলে গ্রিড সিস্টেম। গ্রিড সিষ্টেমে গ্রাম সংস্কার ক'রে ইতালির মুসোলিনী ও হিটলারের জার্ম্মানী পৃথিবীর মধ্যে উন্নততম দেশ হয়ে উঠেছিল। পায়ে পা দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে গোল্লায় না গেলে ইটালী বা জার্ম্মনীর লোক চিরসুখী হয়ে থাকতে পারতো।

শিল্প গ্রামেও কিছু কিছু সবুজ জমি রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে, কাঁচা ও তাজা তরিতরকারির জন্য। এই ধরণের জমিকে হিটারল্যাণ্ড বলে। শিল্প-গ্রাম সাজাবার পক্ষেও হিটারল্যাণ্ডের দাম অনেক। শস্যের ও গাছপালার সবুজ রঙ ও আকাশের নীল, এবং জলের নীল আছে বলেই মানুষের চোখগুলোর আরাম হয়, শুধু ঘরবাড়ী ও ইট পাথর দেখতে দেখতে চোখের ডিসপেপসিয়া হয়ে যায়।

প্রায় দু'শ বছর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য করলেও দু'টি একটি রেললাইন বসান ছাড়া ইংরেজ আমাদের দেশে চলাচলের কোন ব্যবস্থাই করে নি। রেল ভাল অবিশ্যি, কিন্তু দূর দূর দেশের জন্যেই রেল ভাল, কাছাকাছি বা খুচ খুচ খুচরো দূরত্বে রেল ভাল নয়। এ সবের জন্যে রাস্তা ও নদী বা খালই ভাল। পেট্রোলের ট্যাক্স থেকে আর মোটর গাড়ীর কর থেকে বছরে কত কোটি কোটি টাকা

বাঙ্গলার লাভ হয়। এখন বাঙ্গলা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ট্যাক্স কিছু কমবে বটে কিন্তু খুব বেশী কমবে বলেও মনে হয় না। পেট্রোল ও মোটর গাড়ী পশ্চিম বঙ্গেই বেশী চলে; তুলনায় পূর্ব্ববঙ্গে অনেক কম। তাই আমার অনুমান অনেকগুলি কোটী টাকা রাজস্ব জমবে। এই টাকা খাটিয়ে অনেক চলাচল ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব। গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করতে থাকুন, আর আমরা আমাদের দ্বারা কোন্ কোন্ কাজ হ'তে পারে তাই ভাবতে থাকি। জয়গাঁওয়ের 'জয় নালা'র কথা আমি আগে একদিন আপনাদের কাছে বলেছি। তাতে এখন নৌকা চলছে; আশা আছে, ছোট খাট ষ্টীম লাঞ্চ, ষ্টীমারও চলবে। এই খালের দু'ধারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখলে চোখের পাপ পালায়। প্রত্যেক গ্রামবাসীই ইচ্ছে করলে গ্রামের ধার দিয়ে বয়ে-যেতো, কিন্তু এখন-নেই এই ধরণের হাজা মজা নদীগুলিকে বাঁচিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ করে তুলতে পারেন।

ভাইসব, বিজয়ার নমস্কার ও আদাব জানাই। আমি হিন্দু, তাই বিজয়ার পরে আপনাদের সঙ্গে আজ প্রথম দেখা হচ্ছে, প্রীতি সম্ভাষন জানানো আমার কর্ত্তব্য। আমি হিন্দুকেও কোলাকুলি করতে চাই, আর মুসলমানকেও আলিঙ্গনে বাঁধতে চাই।

কিন্তু ভাই আমার মনে সুখ নেই। আমার ব্রাহ্মণী নোটিশ দিয়েছেন ভাত রাঁধতে পারবেন না। বলেছেন যতদিন না কয়লা পাওয়া যাবে, তিনি রান্নাঘরে ঢুকবেন না, আড়া থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাবেন না। সদ্ ব্রাহ্মণের কন্যা, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠলেও কথার নড়চড় হবার নয়। অতএব অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল, বুঝতে পারছেন ত? দিন দুই আগে মশাই, দু'ঘণ্টা কিউয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ সের কয়লা পেয়েছিলুম। দু'দিন, এক বেলা ক'রে বেঁধে, ন্যাশান্যাল ফ্রিজিডেয়ারে রেখে দু'বেলা ক'রে চালান গেছল। কিন্তু আজ সকালে দেখা গেল, আকায আঁচ দেবার মত দু'টুকরো কয়লাও নেই। রান্না বন্ধ। কাজে-কাজেই ন্যাশানাল ফ্রিজিডেয়ারও অকেজো। ন্যাশানাল ফ্রিজিডেয়ার অথবা আদি ও

অকৃত্রিম স্বদেশী রেফ্রিজারেটারটি কি, তা আপনারা জানেন ত? যদি না জানা থাকে, শুনে নিন্। সকালে ভাত রান্না হোল, দুপুরে যা পারলেন, আধপেটা বা পৌণে পেটা খেলেন আর বাকীটা একটা পাথরের জাম বাটীতে কলের ডিসটিলড ওয়াটার অর্থাৎ কিনা জল ঢেলে একটা বাটী বা পিঁড়ে চাপা দিয়ে রেখে দেবেন। সাবধান, বেড়ালটা বাটপাড়ি না করে বসে। কি, হাসছেন যে! ওঃ আপনারা জানেন? পান্তা ওর নাম? পল্লীগ্রামের লোক পান্তা বলতে পারে, উড়েরা পাঁকাড় ভাতও বলতে পারে, কিন্তু আমরা রাষ্ট্রধানী কলকাতা সহরের লোক। আমরা বলি, ন্যাশানাল ফ্রিজিডেয়ার। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

আচ্ছা, আপনাদের কাছে আমার একটা সকরুণ ভিক্ষা আছে। আমি খবর পেয়েছি আপনাদের অনেকের ঘরে মোষ আছে, মোষের গাড়ীও আছে। আপনাদের সকলের মিলিয়ে কতগুলি মোষ আছে? শ'খানেক হবে, বেশ, বেশ, আর ভঁইষা গাড়ী, খান ত্রিশ চল্লিশ—বাঃ উত্তম হয়েছে। এই গাড়ী ও মোষগুলি দয়া করে ধার দেবেন, এই গরীবকে? আমি সুদসমেত মজুরী পুরোপুরি দোব, একটি আধলা পয়সা তঞ্চকতা করবো না।

মশাই ওগো, শুনেছেন আপনারা, রেলের ড্রাইভার নেই, ড্রাইভারের অভাবে রেল চলছে না, কয়লার খনিতে কয়লার হিমালয় পড়ে আছে, ওয়াগন নেই, কয়লা আসছে না। ড্রাইভাররা সব বেশীর ভাগ ছিল মুসলমান, তারা পাকিস্তানে চলে গেছে, ড্রাইভার তৈরী করতে এক বছর থেকে তিন বছর সময় লাগবে। আমার ব্রাহ্মণীর ধনুর্ভঙ্গ পণ, কয়লা না এলে তিনি রান্নাঘরে ঢুকবেন না। আমি কি তবে আগামী তিন বছর গুড় মুড়িই খেতে থাকবো? পেট্রোলের নাকি ভারী টানাটানি। মোটর লরী গিয়ে খনি থেকে কয়লা আনবে তা'ও নাকি সেই জন্যে সম্ভব হচ্ছে না। আর লরীই ছাই এত পাওয়া যাবে কোথায়? বিলেত থেকে আসবে, তবে ত? সে এখন সাত সমুদ্দুরের কথা। বিলেত থেকে লরী তৈরী

হয়ে ভারতবর্ষে এসে কয়লা বইবে। বিবি বড় হ'তে হ'তে সাহেব না গোবে যায়।

এখানে লরী তৈরী হবে? বেশ ত', হোক না। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, সিন্ধি কোটীপতি লোক ত অনেক আছেন তাঁরা লরী তৈরী করতে থাকুন,—বিড়লা ডালমিঞা সাহেবেরা ক্রোড় পতি, তাঁরাও লেগে যান, আমরা পুঁটি, কুচোচিংড়ী দলের লোক, সুন্দরী কাঠ কেটে ভঁইষা গাড়ী ঝপাঝপ্ খানকতক ক'রে ফেলি আসুন। মোষের গাড়ীতে তিরিশ মণ কয়লা অনায়াসে বোঝাই হয়। এক জোড়া মোষ দিনে বিশ মাইল বেশ চলে। প্রতি বিশ মাইলে আমরা মোষ জোড়া বদল করবো। কলকাতা থেকে কয়লাখনি এক'শ চল্লিশ মাইল পথ বৈ ত নয়। সাতদিনে কয়লা এসে যাবে।

আগেকার কালে যখন রেল হয় নি, তখন আমাদের দেশে ঘোড়ার, উটের ও গরুর গাড়ীর ডাক ছিল এ বোধ হয় আপনারা শুনেছেন। দেশের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ঐ ডাক গাড়ীই জিনিষপত্র ও ডাক নিয়ে যেত এবং নিয়ে আসতো। ত্রিশ চল্লিশ মাইল অন্তর অন্তর অন্তর ঘোড়া বদলে বদলে যতদূর হোক্ না কেন, ডাক নিয়ে যাওয়া আসা হোত। একে ঘোড়ার ডাক্ বলতো। আমরা আমাদের কাজকে কয়লার ডাক্ বলবো। গাড়ীগুলো খনির দিকে যাওয়ার সময় খনি অঞ্চলের কোন জিনিষ বোঝাই ক'রে যেতে পারে যদি, তাহ'লে ভারি সুবিধে। ধরুন আমাদের প্ল্যানটা এই রকম হোল :—

জানা গেল যে কোনও ব্যবসায়ী কি গভর্ণমেণ্ট, বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল অঞ্চলে গরুর খাদ্য, খোল কিম্বা জমির সার (ম্যানিওর) পাঠাবার কথা ভাবছেন। আপনারা গিয়ে তাঁদের বলতে পারেন যে, মশাই আমাদের গাড়ী যাচ্ছে, ভাড়া দিন আমরা জিনিষ পৌছে দোব। তাঁদের রাজী না হবার কোন কারণ নেই। আজ সোমবার সকাল ৭টায় ন্যাশান্যাল ট্রান্সপোর্ট কলকাতা থেকে

ছাড়লো, সন্ধ্যে হবে, ২০ মাইলের মত—চুঁচড়োয়। আগে থেকে চুঁচড়োয় এক জোড়া মোষ পাঠানো হয়েছে। কলকাতার মোষ জোড়াকে চুঁচড়োয় রেখে চুঁচড়োর মোষ জোড়াকে জোয়ালে জুড়ে রওনা দেওয়া হোল। আবার কুড়ি একুশ মাইল পরে, চল্লিশ মাইলের মাথায় মোষ বদল। তারপর ফেরবার পথে যে যে জায়গায় মোষ রেখে গেছি বিশ্রাম করবার জন্যে, সেই সেই জায়গায় মোষ বদলাতে বদলাতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কলকাতায় আগমন। আসানসোল অঞ্চলে কয়লা কেনা হোল, রাস্তার খরচ খরচা ধরে যা দাম পড়লো, সেই দামে বা কিছু লাভ রেখে কলকাতার গেরস্থর ঘরে কয়লা বিক্রী করা গেল। গিন্নিদের হাঁড়ী মুখে হাসি ফুটলো, অধীনের ব্রাহ্মণী পুনরায় রান্না ঘরে ঢুকলেন। কি বলেন, দেবেন, মোষ ধার? আমাকে না দেন, নিজেরাই ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড কোল্ ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী খুলে দিন না কেন?

আসল কথা হচ্ছে কি জানেন? স্বাধীন দেশের লোক সকল বিষয়ে পরাধীন হ'য়ে পড়ে থাকে কেন? বিলেত স্বাধীন দেশ। এবছর সে দেশের শ্রমিকদের যতখানি ইস্পাত তৈরী কর্‌বার কথা ছিল, শ্রমিকরা তার সওয়া গুণ বেশী লোহা ও ইস্পাত ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রমিকরা ইচ্ছে কর্‌লে অসাধ্য সাধন কর্‌তে পারেন। আমাদের স্বাধীন দেশের মানুষরাও দেখিয়ে দিন্ যে, তাঁরাও ফেলনার নন্।

মোষের গাড়ী ক'রে কয়লা খনি অঞ্চল থেকে কয়লা আনবার কথা বলছিলুম। কথাটা ঠাট্টা করে বলি নি। করা যায় সত্যি, ভেবে চিন্তে এই বিবেচনা করেই তবে ঐ কথাগুলি বলেছি। আজ বিলেতের দেখাদেখি আমরা সাহেব হয়ে পড়েছি তাই, নইলে ঐ গাড়ীই ছিল আমাদের ন্যাশানাল ওয়েলথ—জাতীয় সম্পদ্। গরু বা মোষের গাড়ী ও নৌকো দিয়েই এই বিশাল ভারতবর্ষ ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানী চালাতো। ও গুলোর স্পীড নেই, বড্ড ধীরে সুস্থে চলে, ওদের দিয়ে আজকের তড়ি ঘড়ি কর্ম্ম চলতে পারে

কি না এটা অবশ্য ভাববার কথা বটে। কিন্তু আমি বলি কি, যার একটাও মামা নেই, কানা মামা পেয়ে সে যেমন খুশী হয়, আমাদেরও তেমনই বাসি আকা না রেখে কিছু কিছু কাজ সুরু ক'রে দেওয়া যেতে পাবে।

একটা কথা উঠবেই, এত গরুর গাড়ী আছে কি? যেগুলো আছে সেগুলো ত কাজ করছেই, তবে কয়লার ডাকের জন্যে গাড়ী কোথায় পাওয়া যাবে? এ কথার উত্তরে আমি বলবো, গরুর গাড়ী তৈরী করাতে অনেক বেশী সময় লাগে না। আমেরিকা বা ইংলণ্ড থেকে মাল কিম্বা মিস্ত্রী আনাবারও দরকার হয় না। বনে সুঁদরি গাছ আছে, গ্রামে গ্রামে বাঁশের বন আছে, ঘরে ঘরে পাট, শণ ও কাতার দড়িও আছে, ঘরে ঘরে করাত, কুড়ুল, শাবল, দা, বাঁ্যাদা, ঘিস্কাপও আছে। আর গ্রামে গ্রামে কামার শালাও আছে। চাকার হাল তিনি ছাড়া আর কেউ করাতে পারেন না। পুরানো লোহা গলিয়ে তিনি হাল তৈরী করবেন। হাল করাতে তাঁর কতক্ষণ সময় লাগবে? জানেন ত, ঘোড়া হাল চাকার অভাবে কাজ আটকে থাকে না। গাড়ী তৈরী হলে কি আর হালের জন্যে ব'সে থাকতে হবে? রবারের চাকাও লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রবারের চাকায় নাকি ভইষা গাড়ীরও স্পীড বেড়ে যায়। কংক্রিট বা টার ম্যাকাডামের রাস্তায় রবারের চাকাওলা ভইষা গাড়ী চললে রাস্তাও ভাল থাকে। রবারের চাকাও, ভাই, বিলেত থেকেআনতে হ'বে না, আমাদের দেশে যথেষ্ট রবারের চাকা তৈরী হচ্ছে। আমাদের হুগলীর গায়েই শাপুরে ডানলপ কোম্পানীর যে কারখানা আছে সেই ডানলপ একলাই বাঙ্গালা দেশের সমস্ত ন্যাশানাল ট্রান্সপোর্টের পায়ে পাদুকা পরিয়ে দিতে পারে।

তারপর কথা উঠবে, অত মোষ কোথায় পাওয়া যাবে মশাই? কলকাতা শহরে কত মোষ আছে, অনুমান করুন তো। নামজাদা খাটাল গুলো ছেড়ে দিন, সহরে যেখানটায় একটু খালি জমি আছে সেইখানেই পশ্চিমে গোয়ালারা দশ বিশ পঞ্চাশটে মোষ বেঁধে

ফেলেছে। বালতি বালতি দুধে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে কলকাতার লোককে 'খাঁটি" দুধ খাওয়াচ্ছে। কেমন ত? এগুলো অবিশ্যি সবই মাদি মোষ। মেয়ে মোষকে দিয়ে গাড়ী টানানো উচিত নয়, তা আমি জানি। কিন্তু ঐ গোয়ালারা যেখান থেকে স্ত্রীমেষ আনে, সেখানে পুরুষ মোষও ত আছে? আনানো যায় না কি? এখানে যে সব স্ত্রী-মোষ আছে, তাদের কি পুরুষ বাচ্ছা হয় না? তারা কি ষড়যন্ত্র ক'রে সবই মেয়ে প্রসব করে?

দেখুন ভাই, ইংরিজিতে একটা কথা আছে Where there is a will, there is a way অর্থাৎ কিনা, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কথাটা সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি করে বলছি, সত্যি। কিছু করবো না, বসে থাকবো, হাত পা নাড়বো না, জবদগব হয়ে তীর্থের কাকের মত পরের অনুগ্রহ চাইবো, তা' হ'লে শুধুই অন্ধকার দেখতে হবে, হতাশই হতে হবে : কষ্টই পেতে হবে।

আমি যে পণ্য বাড়াও পণ্য বাড়াও, জিনিষ বেশী ক'রে উৎপাদন করো, উৎপাদন ক'রো ব'লে সাধ্যি সাধনা করি, সে কি শুধু কারখানার কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যেই বলি? না, গ্রামের ছুতোর, জেলে, কামার যিনি যে কাজ করেন, তাঁকেই আমি বলি, কাজের মাত্রা বাড়াতে। গোয়ালা যে, সে দয়া ক'রে দুধই বাড়াক, সে'ও ত দরকার। ছেলেপুলেগুলো, বুড়ো সুড়ো, লোকে খেয়ে বাঁচুক। যার বেড়ার গায়ে সিম ও উচ্ছে ছাড়া আর কিছু নেই, সে ঐ দু'টোই বাড়াক্, তাও ফেলনার নয়।

গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী যারা তৈরী করেন, তাঁরা তাই দশখানা বিশখানা বেশী করে তৈরী করুন, তারও বিশেষ দরকার। বিলেত মোটর লরী পাঠাবে, বড় লোকেরা ও শিল্পপতিরা মোটর ট্রাক্ তৈরী করবেন, এ সবই বড় বড় কথা, সময় সাপেক্ষ। যথাকালে হয়, হোক না, কেউ-ত বারণ করছে না। মাড়োয়ারী বিড়লা—ডালমিয়ারা নাকি কারখানা টারখানা বসিয়ে দিয়েছেন—বেশ করেছেন, অতি উত্তম করেছেন। আমরা—বাঙলা মায়ের

সন্তানেরা—তাঁদের পানে জুল জুল ক'রে চেয়ে থাকি? কেমন? আমাদেব বাঙ্গালী বডলোকবা কিছু করেন না কেন? অনেকের শুনি টাকায় ছাতা ধরে যাচ্ছে। তবু তাঁরা নডবেন না কেন? আপনি ও আমি পুঁটিমাছ, আমাদের দ্বারা মোটব টোটর হবে না, তা ঠিক, কিন্তু ওটা হবে না ব'লে কি অন্য কাজেও আমবা হাত দোব না? কবে বাধা নাচবেন, সাত মণ তেল পুডবে, সেই আশাতেই দিন কাটাতে হবে? নিশ্চয়ই না।

আপাততঃ কিছু কবে পৃথিবীটাকে চালু রাখতে হবে-ত—লোককে খাইযে পবিযে বাঁচিযে বাখতে হবে-ত। তাবই জন্যে কাজ বাডাতেই হবে—পণ্য বৃদ্ধি কবতেই হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি কবাই চাই। একটি ছোট্ট সরু ছুঁচ—অত্যন্ত অল্প মূল্য, কিন্তু গেরস্তের সংসাবে তাবও অনেক কাজ।

আজকেব খবরেব কাগজে খবব বাব হয়েছে যে নভেম্বব মাস নাগাদ কযলার ঝামেলা মিট্‌তেও পারে, ততদিন পর্য্যন্ত,

"থাক্‌রে কুকুব আশাব আশে
ভাত দোব তোরে অঘ্রাণ পোষে।"

কেমন?

তার চেযে গোযেব গাডী চ'ডে কয়লা খনি যাত্রা কবা কি ভাল নয?

আপনাবা ভেবে দেখুন, কোনটা ভাল? ভিখিবীব মত থলে ঘাডে করে দোকানে দোকানে কিউ দেওযা ভাল, না, যা থাকে কুল কপালে ব'লে কযলা আনতে বেরিযে পডা ভাল?

আমি কাল বলে'ছি, আজও বলছি, আমাদের ন্যাশান্যাল ওয়েলথ হচ্ছে ঐ ভঁইষা গাডী, গরুব গাডী। অনেক বড লোক মশাই আছেন, যাঁরা বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায লাথি মাবেন। আমরা, রেল, মোটর, এরোপ্লেন, সি'প্লনগুলো দেখে আমাদের দুঃখী" ন্যাশান্যাল ট্রান্সপোর্টখানার পানে ফিরেও চাই নে। কলকাতার রাস্তায় ক্যাঁচ কোঁচ রবে, হেট হেট শব্দে গদাই লস্করী চালে, আপনার মনে

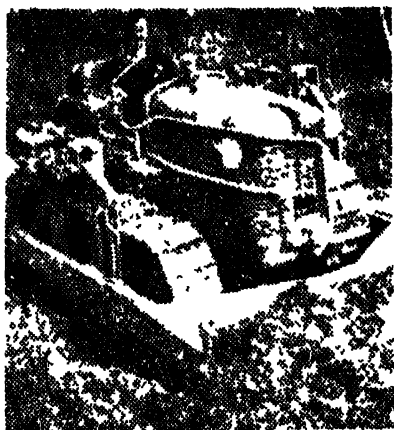
ভৈববী ভাঁজতে ভাঁজতে চলতে দেখেও আমরা চটে মটে কাঁই হইছি, অনাদবে অযত্নে অবহেলায বড বাস্তা ছেড়ে তারা গলি ঘুঁজিতে মুখ লুকোয। আমরা যতই স্বদেশী স্বদেশী বলে চীৎকাব কবি না কেন, মনের মধ্যে আমবা খাঁটি বিদেশী বনে গেছি। ভঁইষা গাডীব নামেই আমাদেব নাক অক্টাবলোনি মনুমেণ্টেব মাথায উঠে যায়।

ন্যাশান্যাল ট্রান্সপোর্টকে মডার্ণ অর্থাৎ আধুনিক ও ফ্যাসানেবল কববাব একটা উপায় আমাব মাথায গজিযেছে, বলছি শুনুন। আপনাবা নিশ্চযই দেখেছেন, যুদ্ধেব বাতিল কবা লাখ লাখ মোটর গাডীব ধুবা (য্যাক্সল) ও চাকার কাঠামো (বিম) যেখানে সেখানে পাহাড পর্ব্বত হযে আছে। এই বল্ বেযাবিং ফ্রেমে ববারের চাকা লাগিযে নিযে দিগ্বিজযে বার হলে, মোষগুলোও মনেব আনন্দে গাডী টানে, তাদেবও কষ্ট কম হয, চলেও জলদি আব রাস্তাও খাবাপ হয না, এবং হটব হটব ঘটব ঘটব শব্দ বন্ধ ও ঘট ঘট ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং কমলে আমবা আপনাবাও সুখা টিপতে টিপতে কিম্বা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্ট চডে যাওযা আসা কবতে আর ভয় পাবো না। আবে মশাই, আমাব ও আপনার চৌদ্দপুরুষ তাই কবে গেছেন। তাঁবা বুঝি মানুষ ছিলেন না? না?

ছেলেরা বেশ কাজ করছে, খুব কাজ কবছে। এই ক' মাসে তাদেব মনও খুব ব'সে গিয়েছে, শবীরও তাদের ভালই আছে। আজ সেই দিনেব কথা মনে পড়েছে যখন এতগুলি বাপ মার ছেলেকে নিয়ে আমরা প্রথম বার হযেছিলুম।

ভাবনা—বিষম ভাবনা ছিল, ম্যালোয়াবীর। আমাদের সঙ্গে সামান্য সামান্য ওষুধ পত্র ছিল বটে, হোমিওপ্যাথি আর কুইনিনই তার মধ্যে বেশী, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, ছাতিম গাছ, ছাতিম পাতা ও রস। যার তার প্রেসক্রপসান্ নয়, ধন্বন্তরীকল্প খোদ বিধান রায়ের

পল্লী চলো







ব্যবস্থাপত্র—ম্যালেরিয়া জ্বরে ছাতিমের রস অব্যর্থ। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, খাঁটি সত্যি। পল্লীগ্রামের লোক ছাতিমের পানে ফিরেও চাইতো না কখনও, সেই ছাতিমের এত প্রতাপ দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল; তারপর চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, জয় বাবা তারকনাথ বিধান ডাক্তার। তারকেশ্বরের তারকনাথ ঠাকুরই সবাইকে ওষুধ দেন, লোকে ভালও হয়. তাই আমাদের মুখে বিধান রায় শুনে ধ'রে নিলে যে, তারকনাথ বিধান ও রায় এক। হরিবোল্ হরি।

আরও একটি ভীষণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল। এটি সত্যিই দুর্ভাবনা।

বাপ, মা, দাদা, কাকা, জ্যেঠা, জেঠি, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিলেন, এক সঙ্গে সকলের শিরঃপীড়া, ভীষণ মাথা ব্যথা। হায় হায়, ছেলেগুলো ব'য়ে গেল গা। লেখা-পড়া, ইস্কুল-কলেজ, বই খাতা ছেড়ে ছুড়ে, হায়, হায়, গেল কিনা পল্লী মাতা উদ্ধার করতে। ছিঃ ছিঃ, কি দুর্বুদ্ধি। পৃথিবী রসাতলে যায় আর না যায়। বকা-ঝকা, গালাগাল-মন্দ, রাগ-ঝাল, মান অভিমানের পালা প্রায় সব বাড়িতেই চললো। ছেলেদের অসীম ধৈর্য্য, মুখ বুজে সব হজম করছিল। কিন্তু আমাদের—যারা মোড়ল সেজেছি, তাদের মনের ভেতর একটু আধটু অস্বস্তি হয়েছিল, এট সত্যি কথা। মনের অগোচর ত পাপ নেই। অন্ধকারে অজানায় যে 'দিই লাফ' করা হচ্ছে সেটা ত ঠিকই।

দুর্ভাবনা দূর হোল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলারের উদার ঘোষণায়। সুপণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক ভাইস চ্যান্সেলার খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন, ছেলে-মেয়েরা যদি নগরে বা পল্লীতে সামাজিক উন্নতিমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তা'হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিচের এই সুযোগগুলি তাদের দেওয়া হবে:

ম্যাট্রিক্ ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী, ন্যূনকল্পে ৬ মাস পল্লীগ্রামে নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য্য করলে, তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে।

৬ মাসে তৃতীয় বিভাগ ; ৯ মাসে দ্বিতীয় বিভাগ ; ১২ মাসে প্রথম বিভাগে পাশ ব'লে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ শেষ করে কেউ একাদিক্রমে ৬ মাস, এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠান্তে ৬ মাস একসঙ্গে কার্য্য করলে সার্টিফিকেট, ডিগ্রী (ডিপ্লোমা) দেওয়া হবে। ডিভিসন সম্বন্ধে আই-এ পরীক্ষায়, ৬, ৯, ১২ মাস এবং বি-এর বেলায় ৬ মাসে পাস কোর্স, ৯ মাসে অনার্স ও ২ মাসে 'হাই অনার্স'।

ছেলেরা বড় বড় মোটা মোটা গোড়ের মালা নিয়ে 'ভাইস' প্রমথনাথকে প্রণাম করতে গেলো। তিনি বললেন, ভগবান তোমাদের ভাল করুন। বঙ্গদেশ যেন তোমাদের মা বলে পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করেন।

ছেলেদের উদ্যম ও উৎসাহ দেখে আমি তাক্ হয়ে গেছি। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা করে ফেলেছে। আর সে রাস্তা কলকাতার রাস্তার চেয়ে ঢের ভাল। তারপর জয়নালা-টা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গঙ্গা থেকে নালা কেটে জয়গাঁও ঘুরিয়ে নালাটাকে আবার গঙ্গায় মিশিয়ে দিয়েছে, জয়গাঁওয়ের সমস্ত জমির জল সেচ হচ্ছে ঐ নালা থেকে, মাছ ফেলেছে হাজার হাজার হাঁড়ী, নালার দু'মুখে দু'টো লোহার দরজা ক'রে দিয়েছে—মাছ না বেরিয়ে যায়, ভরা জোয়ারে দরজা খুলে দেয়, হুড় হুড় করে জল ঢুকে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার মাছও ঢোকে নিশ্চয়—নইলে জয় নালায় বড় বড় মাছের হুড়্দুম ঘাইয়ের শব্দ হয় কি করে? ঐ জয়-নালায় ছেলেরা ক'খানা সরু সরু লম্বা লম্বা 'ছিপ' ভাসিয়েছে, বিকেলে বাচ্ খেলে। বাচ দেখতে বিশখানা গ্রামের মেয়ে পুরুষ ছেলে পুলে ভেঙ্গে পড়ে। কলকাতার ডাক্তার শৈলেন সিঙ্গী একবার বেড়াতে এসে আমাদের তৈরী আদর্শ পল্লী দেখে খুসী হয়ে এখানে একটা লাইব্রেরী ক'রে দিয়েছেন।

মুখুজ্জে মশাইরা ত্রিশ বছর, মজুমদার মশাইরা আটাশ বছর, মিত্রে মশাইরা দশ বছর, মওলানা সাহেব সাত বছর, পালজাবা পাঁচ

বছর দেশ ছেড়ে ভাগল-বা হয়েছিলেন। যেমন খবর শুনলেন, ম্যালোয়ারী মারা গেছে, তাঁরা একে একে দু'য়ে দু'যে গ্রামে এসে জমপেশ হতে লাগলেন। তাঁরা হলেন কবিৎকর্ম্মা লোক, টাকাওলা মানুষ, সেই যে কথায় বলে না, হাত ঝাড়লে পর্ব্বত। এসেই একটা কাগজের কল, একটা কাপড়ের কল বসিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজলী বাতি। শুধু বিজলী বাতি? না, গো, না। বিজলী হবামাত্র এক শ' একটা কটেজ ইনডাস্ট্রী শুরু হয়ে গেছে। হারু কর্মকার ইলেক্‌ট্রিক চাকে কাঠের কি সুন্দর সুন্দর খেলনা পুতুল যে তৈরী করছে সে আর কি বলবো।

জয় ক্লথ ও জয় কটন মিল একদিনে তামাম্ বাজীমাৎ ক'রে দিয়েছে, সেটা বলি শুনুন। তারা বললে, মিল দু'টোতে যারা চাকরী করবে, তাদের ভেতরই মিলের অংশ (শেয়ার) বিক্রী হবে। মাইনে যে যা পাবে, সে ত পাবেই, তা ছাড়া লাভের অংশও তাদের, মালিকও তারা। পাঁচ শ' সাত শ' লোক চাকরী করতে এলো, তারা দশ টাকা থেকে দু'তিন শ' টাকার শেয়ার কিনে ফেললে। তাদের কেনা শেষ হ'লে, গ্রামের লোকদের ডাক পড়লো। গ্রামের লোকও শেয়ার কিনলে—যে যা পারলে। মাতব্বর মিত্র মজুমদার মুখুজ্জে মশাইরাও কিছু কিছু কিনলেন। কাজেই স্রেফ্ জয় গাঁওয়ের লোক আর মিলের কর্মচারীরাই মিল দু'টির মালিক হলেন। এখন বাকী রইলো একটি ছোট্ট খাট সিনেমা আর একটা থিয়েটার। শৈলেন সিংহের "রবীন্দ্র নগর" দেখে এসে আমাদের ছেলেরা জয়গাঁওয়ের লোককে মাতিয়ে তুলেছে, ও দু'টো চাই। তারাও রব তুলেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, চাই-ই ত। 'পার্থসারথীর' ওপর ভার পড়েছে, প্রথম নাটক লেখবার; নাটকের নাম হবে "পল্লী-বাণী।" সত্যি কথা বলতে কি, আমার কিন্তু সিনেমার ওপর ভালবাসা নেই। সিনেমা ছেলে-মেয়েদের মাথাগুলো চিবিয়ে খাচ্ছে। থিয়েটার অনেক ভাল।

সেই যে তিনটে কল্ (বুল ডোজার, ক্যারি অল্, ট্রাক্টর)

ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আনা হয়েছিল, তা এখন ফেরত দিতে হবে। এখনকার মত কাজ ত হয়ে গেছে, পরে দরকার পড়ে, আবার আনা যাবে, ভাব আর কি! এ ত ঘরের কথা। আমরা কলকাতায় যাচ্ছি লাট বাহাদুরকে বলতে, তিনি যেন কলগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। আর—এই 'আর' নিয়েই মুশ্‌কিল! তা মুশকিল হোক্ আর যাই হোক বলতে ত হবেই। চোখ কান বুজে ব'লে ফেলাই ভাল।

স্বাধীন বঙ্গের লাট বাহাদুরকে আমাদের আদর্শ পল্লী 'জয়গাঁও" দেখতে যেতে হবে। আমরা দল বেঁধে লাট বাড়ীতে হাজির। লাটের সম্মুখে দাঁড়াতেই, লাট বাহাদুর বললেন, কি হে বাপু-সকল কি চাও?

আমরা বললুম, মহারাজ, ভয়ে ক'ব, না নির্ভয়ে ক'ব?

লাট বহাদুর বললেন, নির্ভয়ে কহ শুনি।

আমরা বললুম, মহারাজ, অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে আমাদের "জয়গাঁও" দেখতে যেতে হবে। কলকাতা থেকে সোজা পাকা সড়ক, আপনার অশোক চক্র আঁকা মোটর না ন'ড়ে ন'-লাফিয়ে না-কেঁপে দিব্যি চলবে। মহারাজ, আমাদের জয় নাগায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পাল টাঙ্গানো ছিপ রেখেছি, লাট বাহাদুর জল ভ্রমণ করবেন ব'লে। আমরা পুকুরে পুকুরে মাছ, ঘরের ধারে ধারে তরী তরকারী, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল করেছি। আমাদের নিজের ইলেকট্রিক, নিজের ইনডাসট্রি, আমাদের নিজের মিল, নিজের ইরিগেসন (সেচ)। মহারাজ, আমরা একদিকে যেমন বন কেটে সাফ করেছি, অন্যদিকে তেমনই হাজার হাজার ফলের চারা গাছ লাগিয়েছি, আইন করেছি একটি গাছ যে কাটবে, আর একটি গাছ তাকে বসাতেই হবে, নইলে ফাইন্ (দণ্ড) হবে। আরও একটা দু'টো কাজ করেছি মহারাজ, যা আপনি গিয়ে দেখলেই ভাল হয়।"

লাট বললেন, আহা বলই না বাপু সকল, শুনি।

"মহারাজ, আমরা দু'টো ইস্কুল বসিয়েছি—একটা মাঠে আর একটা ঘরে। মাঠের ইস্কুলে হাতে নাতে কাজ আর ঘরের ইস্কুল রাত্রে ব'সে, তাতে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোর-আন্ থেকে গল্প পড়ান হয়। আর একটু আধটু অঙ্কও শেখাই; তার বেশী কিছু নয়। আর—"

লাট হেসে বললেন, কি হে বাপু, থামলে যে।

'আজ্ঞে মহারাজ, অপরাধ নেবেন না ভরসা দেন যদি, তবেই বলতে পারি।"

"ভরসা—ভরসা!"—লাট বাহাদুর হাঁকলেন।

আমরা বললুম, মহারাজের যেদিন পায়ের ধূলো পড়বে, সেদিন আমরা ছত্রিশ জাত এক সামিয়ানার তলায় এক সঙ্গে পংক্তিভোজন করবো—বামুন, শূদ্র, নবশাখ—হাঁড়ী, মুচি, ডোম, সাঁওতাল সব এক সঙ্গে ব'সে খাবো। যদি মুসলমান ভাইরা আসেন, তাঁরাও—

লাট জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাঁরা কি আসবেন না বলেছেন?

"ঠিক জানি নে মহারাজ। তবে তাঁরা গুঁই গাঁই করছিলেন। আমরা কিন্তু চেষ্টা ছাড়ি নি।"

লাট বললেন, বাপু সকল, নিশ্চয় তোমাদের "জয়গাঁও" দেখতে যাবো। তোমাদের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পংক্তি ভোজনে খেতে বসতে না-ও পারি যদি, খাওয়া দেখতে পাবো—খাওয়া দেখতে আমি বড্ডই ভালবাসি।

"জয়হিন্দ! বন্দেমাতরম্!"

লাট বাহাদুর নমস্কার ক'রে ঘরে চলে গেলেন। লাটবাড়ীতে, লাটের সামনে জয় হিন্দ বন্দে মাতরম্ ক'রে চেঁচানটা বোধ হয় ভাল হয়নি, কিন্তু কি করবো, আমরা যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছলুম। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাইরে এসে কেউ কোথাও নেই দেখে আর একবার খুব জোরে জয়হিন্দ——বন্দে মাতরম্!

গ্রন্থকারের

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর—৩৲

আজাদ হিন্দ সরকার—৩৷৷০

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু বিজয়রত্ন বাবুর এই বই দুইখানি সমস্ত সুভাষ সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। "অঙ্কুর" গুজরাটি, ইংরেজী ও উর্দুতেও অনূদিত হইয়াছে। "সরকার" চিত্র-বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক ও অসাধারণ।